শ্রীঅরবিন্দ

রাষ্ট্রীয় জীবনচরিতমালা

শ্রীঅরবিন্দ

নবজাত

অনুবাদ

এন. আর. মুখার্জ্জী

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া

ভূমিকা

পণ্ডিচেরীর অরবিন্দ আশ্রমের শান্ত পরিবেশে বিশেষ করে মা যেখানে থাকেন সেই প্রধান বাড়িটির শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ায় শান্তি ও আনন্দ লাভ করার জন্য হাজার হাজার দর্শনার্থী এখানে আসেন। এখানকার আঙিনাতেই শ্রীঅরবিন্দের সমাধি। প্রায় ৩৫ ফুট উঁচু একটা বিরাট গাছ, মা যার নাম দিয়েছেন "সেবক বৃক্ষ"—সেটা এই সমাধির ওপর একটা চাঁদোয়ার মত ছড়িয়ে আছে। এখানে এলে সাধক ও দর্শনার্থীদের মধ্যে অনেকে সমাধির চারিদিকে বসে ধ্যানস্থ হন, কেউ বা দিব্যজ্ঞান লাভ করতে অভিলাষী আবার কেউ-বা শ্রীঅরবিন্দের পায়ে নিজেদের পার্থিব দুঃখ-দুর্দশা অর্পণ করে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করেন। তাঁরা সকলেই নিজেদের গ্রহণ ক্ষমতা অনুযায়ী সাহায্য পান আর এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই, কারণ মা বলেছেন যে "শ্রীঅরবিন্দ আমাদের পরিত্যাগ করেন নি - শ্রীঅরবিন্দ সবসময় এখানে বিরাজ করছেন এবং সমগ্র একাগ্রতা, ব্যগ্রতা ও ঐকান্তিকতা নিয়ে তাঁর আরব্ধকাজ সম্পূর্ণ করাই হল আমাদের কর্তব্য।" মা আবারও বলেছেন, "প্রভু, আজ সকালেই আপনি আমাকে আশ্বাস দিয়েছেন যে, আপনার আরব্ধ কাজ সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত আপনি যে শুধুমাত্র আমাদের চেতনার মধ্যে উপস্থিত থাকবেন তাই নয় আমাদের সব কাজে আপনার উপস্থিতি আমরা অনুভব করব। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আপনি অঙ্গীকার করেছেন যে, আপনার সমগ্র সত্তা এখানে থাকবে এবং পৃথিবী রূপান্তরিত না হওয়া পর্যন্ত আপনি পৃথিবী পরিত্যাগ করবেন

না। আমরা যাতে এই বিস্ময়কর উপস্থিতির উপযুক্ত হতে পারি এবং আপনার মহান কার্য সম্পূর্ণ করার জন্য আমরা আমাদের সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করতে পারি, আপনি আমাদের সেই আশীর্বাদ করুন।"

১৯৫০ খৃস্টাব্দের ৫ ডিসেম্বর (রাত্রি ১-২৬ মিঃ) শ্রীঅরবিন্দ তাঁর নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করেন। এক অলৌকিক আলোক-রশ্মি তাঁর দেহটি ঘিরে রাখে এবং পচনক্রিয়া ঘটতে দেয় নি। কাজেই মরদেহটি সাড়ে চারদিনেরও বেশি রেখে দেওয়া হয় এবং ১৯৫০ খৃস্টাব্দের ৯ ডিসেম্বর বিকেলবেলা সমাধিস্থ করা হয়। সব সময়ের জন্য পুষ্পস্তবকে সুবিন্যস্ত এই মর্মর সমাধির ওপর এই কথাগুলি ক্ষোদিত রয়েছে—

"আপনি ছিলেন আমাদের পার্থিব আবরণ, আপনাকে জানাই আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা। আপনি আমাদের জন্য অনেক কিছু করেছেন, আমাদের জন্য সংগ্রাম করেছেন, বহু দুঃখ বরণ করেছেন, আপনি সকলের মঙ্গল কামনা করেছেন, আপনাকে প্রণাম জানাই এবং মিনতি জানাই আপনার কাছে আমাদের ঋণের কথা যেন আমরা এক মুহূর্তের জন্যও ভুলে না যাই।"

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে যে শ্রীঅরবিন্দ কী করে সকল ইচ্ছার, সব প্রচেষ্টার আধার এবং তিনিই আমাদের সকল কামনা পূর্ণ করেন।

এই প্রশ্নের উত্তর যেমন সহজ তেমনি কঠিন। শ্রীঅরবিন্দ লিখেছেন যে "কেউই আমার জীবনী লিখতে পারবেন না, কারণ তা মানুষের বাহ্যিক দৃষ্টির গোচরে ছিল না।" কিন্তু

মানুষ তার বাহ্যিক দৃষ্টি দিয়ে সামান্য যতটুকু দেখতে পায় তাতেই সে অভিভূত হয়। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর রচনাবলীতে তাঁর অন্তরতর জীবন এবং কাজ সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করে গেছেন। এই পৃথিবীর জন্য তিনি কী করে গেছেন তা এই রচনাবলী থেকে কিছুটা উপলব্ধি করা যায়। আমরা এই বইয়ে শ্রীঅরবিন্দের নিজস্ব উক্তি যথাসম্ভব উদ্ধৃত করার চেষ্টা করেছি যাতে পাঠকরা তাঁদের উপলব্ধি অনুসারে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন এবং তাঁর রচনার আধ্যাত্মিক শক্তি থেকে উপকৃত হতে পারেন।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের মহান যোদ্ধা হিসেবে শ্রীঅরবিন্দ স্মরণীয়, লেখক এবং কবি হিসেবে তিনি প্রশংসনীয়, মহান যোগী হিসেবে তিনি শ্রদ্ধার যোগ্য ; কিন্তু এগুলি সবই হ'ল তাঁর ঐশী ব্যক্তিত্বের খণ্ড প্রকাশ।

বিজ্ঞান বলে যে প্রকৃতিজগতে ক্রমোন্নিত ঘটছে ; যেমন পাথর থেকে বৃক্ষলতা, বৃক্ষলতা থেকে জীবজন্তু, জীবজন্তু থেকে মানুষের ক্রমবিকাশ ঘটেছে। ভারতে পুরাণশাস্ত্রে এই ক্রমবিকাশকে দশ অবতার হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। যথা— মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও কল্কি। শ্রীঅরবিন্দ বলেন যে এই ক্রমবিকাশের ধারায় মানুষই শেষ নয়, সেও অস্থায়ী এবং তার চাইতে উন্নততর জীব আবির্ভূত হবে। মানুষ এখন মানসিক চেতনার একটা স্তরে বাস করছে—তার মধ্যে অনেক গুণ সুপ্ত রয়েছে, এই সত্য চেতনা এবং অতিমানস তার ধ্যান-ধারণার বাইরে। ক্রমবিকাশের সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী এই অতিমানসের সৃষ্টি হবে, তবে তাতে হাজার হাজার বছর সময় লাগবে। কিন্তু

এই বিপ্লব যদি এখনই ত্বরান্বিত করা যায়, তবে পার্থিব জীবনেও পরিবর্তন ঘটবে। মানুষের মন হবে আলোর মতো সেখানে সব জ্ঞান স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে থকেবে। এমন-কি, দেহেরও পরিবর্তন হয়ে তা আলোর দেহে রূপান্তরিত হবে। পৃথিবীর সব-কিছুর রূপান্তর ঘটবে। দেবপ্রতিম জীবন বাস্তব সত্য হয়ে দাঁড়াবে।

অখণ্ড রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে দেহেরও রূপান্তর ঘটবে। আর তখনই এর প্রকৃত তাৎপর্য সবার বোধগম্য হবে। বর্তমানে সামান্য কয়েকজন মাত্র তা ভাবতে পারেন।

অতিমানস যুগের প্রবর্তনকারী শ্রীঅরবিন্দকে ভবিষ্যৎ কাল অবতার হিসেবে স্বীকৃতি দেবে। মা এই সম্পর্কে বলেছেন যে, "শ্রীঅরবিন্দ মানবদেহে অতিমানসিক চেতনাকে মূর্ত করেছেন। লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য কোন্ পথ কী পদ্ধতিতে অনুসরণ করতে হবে তিনি তাই শুধু বলে দেন নি, নিজস্ব উপলব্ধি অনুযায়ী আমাদের দৃষ্টান্তও দিয়ে গেছেন, তিনি আমাদের প্রমাণ দিয়ে গেছেন যে এটা করা যায় এবং এখনই তার সময় হয়েছে।" এই পৃথিবীকে অতিমানসিক রূপান্তরের পথে পরিচালিত করতে যিনি অবতার হিসেবে এসেছিলেন, স্বাভাবিক কারণেই প্রাকৃতিক শক্তিগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাঁকে সমস্ত আঘাত সহ্য করতে হয়েছে। তাঁর মহাকাব্য সাবিত্রীতে শ্রীঅরবিন্দ নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তিতে এটা ব্যক্ত করেছেন—

কিন্তু ভগবানের দূত যখন বিশ্বকে সাহায্য করতে আসেন
এবং বিশ্বের আত্মাকে উচ্চস্তরে নিয়ে যান

> তখন যে জোয়াল তিনি মুক্ত করতে আসেন,
> তার বোঝা তাঁকেই বইতে হয়, যে বেদনা
> লাঘব করতে আসেন, তা তাঁকেই সহ্য করতে হয়।

শ্রীঅরবিন্দ শুধুমাত্র এই উদ্দেশ্য নিয়েই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। মা বলেন যে "বিশ্ব-ইতিহাস শুরু হওয়ার প্রথম থেকেই শ্রীঅরবিন্দ বিভিন্ন নামে বিভিন্ন মূর্তিতে পার্থিব রূপান্তরের ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব করে আসছেন।" কতকগুলি বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি করে অতিমানসিক সত্তা প্রকটিত করাই ছিল তাঁর সমগ্র পার্থিব জীবনের অবিরাম প্রচেষ্টা। তাঁর শৈশব-কাল দার্জিলিং ইংল্যাণ্ডে অতিবাহিত হওয়ায় ইংরেজী ভাষা তাঁর সম্পূর্ণ দখলে আসে। কাজেই উচ্চ আত্মিক শক্তি ও আলোকে উদ্বুদ্ধ হয়ে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে গদ্যে বা পদ্যে তিনি যখন যা লিখতেন তখন তা প্রাচীন ঋষিদের সংস্কৃতের মতো একটা মন্ত্রশক্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠত। তাঁর রচনা পাঠ করলে আত্মিক উন্নতি হয়। এগুলিতে তাঁর আত্মিক উপলব্ধির প্রকাশ ঘটত। তাঁর যদি ইংরেজী ভাষার ওপর এই দখল না থাকত তা হলে তিনি এত সার্থকভাবে নিজেকে প্রকাশ করতে পারতেন না অথবা ইংরেজী ভাষী জগতের কাছে নিজের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করতে পারতেন না।

পৃথিবীতে ভগবানের রাজত্ব প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে, ভারতের স্বাধীনতার জন্য শ্রীঅরবিন্দের সংগ্রামেরও একটা ভূমিকা ছিল। পরিশেষে তিনি পণ্ডিচেরীতে এসে অতিমানসের শিখরে আরোহণ করার চেষ্টা করেন. শুধু তাই নয়, শরীরে ও মনে, অতিমানসিক শক্তি, জ্ঞান ও আলোক এনে রূপান্তর

ঘটানোর চেষ্টা করেন। তিনি নিজেই বলেছেন যে "আমি নিজের জন্য কিছুই করছি না, কারণ অতিমানসিক শক্তি বা মুক্তি কোনোটারই আমার প্রয়োজন নেই, বিশ্বের চেতনা জাগাতেই আমি অতিমানসিক শক্তি চাইছি।"

মা'ও ১৯৩০।৩১ খৃস্টাব্দে বুঝিয়ে বলেন যে চেতনা হচ্ছে মইয়ের মতো ; সাধারণ চেতনা যাতে উচ্চতর চেতনার স্তরে পৌঁছতে পারে সেজন্য প্রত্যেক যুগে এক-একজন মহাপুরুষ এসে সেই মইয়ে একটি করে ধাপ যোজনা করে যান। উচ্চ স্তরে উঠে জাগতিক চেতনা থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব। তখন আর মইয়ের দরকার হয় না। বিশ্বে যুগে যুগে যে রূপান্তর ঘটেছে সেগুলির প্রধান সাফল্য হল, পার্থিব যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন না করে এই মইয়ে একটি করে ধাপ সংযোজন ; বিভিন্ন স্তরের মধ্যে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে এক ধরনের শূন্যতা সৃষ্টি না করে উচ্চ ও নিম্ন স্তরের মধ্যে সংযোগ বজায় রেখে উচ্চতম স্তরে পৌঁছনোর ক্ষমতা অর্জন করাই হ'ল প্রধান সাফল্য। এই ওপরে ওঠা ও নামা এবং উচ্চের সঙ্গে নিম্নের যোগসাধন করাই হ'ল উপলব্ধির গোপন তত্ত্ব এবং তা হ'ল অবতারের কাজ। অবতার যখন এই মইয়ে একটি করে ধাপ যোগ করেন তখনই তাকে নতুন সৃষ্টি বলা হয়। এখন যে ধাপটি সংযোজিত হচ্ছে শ্রীঅরবিন্দ তাকে বলেছেন অতিমানস। এর ফলে চেতনা অতিমানসিক জগতে প্রবেশ করেও এর বিশিষ্ট সত্তা বজায় রাখতে পারবে। আবার এই পৃথিবীতে নেমে এসে নতুন যুগের সৃষ্টি করতে পারবে। তবে এটাই শেষ নয়। এর চাইতেও উচ্চতর স্তর রয়েছে। বিশ্বকে প্রকৃত অনৈসর্গিক শৃঙ্খলায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য, বিশ্বকে

পুনর্গঠিত করার উদ্দেশ্যে আমরা অবশ্য এখন অতিমানসকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনার জন্য কাজ করছি। এটাকে প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেকটি জিনিসকে তার প্রকৃত স্থানে প্রতিষ্ঠিত করা অর্থাৎ একে বলা যায় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করা। বর্তমানে প্রকৃত সংগঠনের দেবী মহা-সরস্বতীই হলেন প্রধান শক্তি।

"উচ্চ ও নিম্ন মার্গের মধ্যে যোগসূত্র রেখে ধারাবাহিকতা অর্জন করা এবং উচ্চমার্গের জিনিস নিয়ে আনার কাজ চেতনার মধ্যেই সাধিত হয়। যে অবতার এই কাজ করেন তাঁকে যদি বন্দিশালায় রাখা হয় এবং কাউকে যদি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে না দেওয়া হয় তবুও তিনি এই কাজ করে যাবেন, কারণ এটা হচ্ছে চেতনার কাজ, এটা হল অতিমানস ও সাধারণ মানুষের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের কাজ। তাঁকে চিনবার প্রয়োজন নেই। চেতনার এই সম্পর্ক স্থাপনের জন্য তাঁর বাহ্যিক শক্তি প্রদর্শনের প্রয়োজন হয় না। তবে একবার যখন সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে যায় তখন নতুন সৃষ্টির আকারে, আদর্শ নগর স্থাপন থেকে আরম্ভ করে নিখুঁত বিশ্ব-সৃষ্টির আকারে, বাইরের জগতে তার প্রকাশ দেখতে পাওয়া যাবেই।"

মানবসমাজে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক নানা লক্ষ্য ও আদর্শ রয়েছে। এগুলির মাধ্যমে মানুষ তার জীবনের উচ্চতম লক্ষ্যে পৌঁছচ্ছে। কিন্তু এর চাইতেও উচ্চতর বিকাশ সম্পর্কে খুব কম আদর্শই মানবজাতির সম্মুখে রাখা হয়েছে। এই উচ্চতর মার্গেই রয়েছে প্রকৃত সুখ, শান্তি, সম্পূর্ণ জ্ঞান ও ঐশী শক্তির উপলব্ধি। মানবসমাজ

এগুলিই খুঁজে বেড়াচ্ছে। এগুলির মধ্যেই রয়েছে আমাদের আশু সমস্যার স্থায়ী সমাধান।

এই পুস্তিকাটি যদি সামান্য কয়েকজন পাঠককেও অতিমানসিক জীবনলাভে উৎসাহিত করে তা হলেই এর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।

নবজাত

সূচীপত্র

শৈশবকাল

১৮৭২ খৃস্টাব্দে ১৫ অগাস্ট কলিকাতায়, ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষের ভবনে, সূর্যোদয়ের এক ঘণ্টা পূর্বে ভোর ৪-৩০ মিনিটে শ্রীঅরবিন্দ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ডাঃ কৃষ্ণধন ঘোষ একজন অসামরিক মেডিক্যাল অফিসার ছিলেন। তাঁর মা স্বর্ণলতা দেবী, ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যতম বিখ্যাত ব্যাখ্যাকার ঋষি রাজনারায়ণ বসুর জ্যেষ্ঠা কন্যা। শ্রীঅরবিন্দ তৃতীয় পুত্র। তাঁর দুই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিনয়ভূষণ ও মনোমোহন।

রামকৃষ্ণ পরমহংস ১৫ অগাস্ট মহা সমাধি লাভ করেন এবং ঐ তারিখটিতেই ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। শ্রীঅরবিন্দ এই তারিখটির মূল তত্ত্ব ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, "১৫ অগাস্ট হল কুমারী মেরীর স্বর্গারোহণ দিবস : এর অর্থ হল আধি-ভৌতিককে আধিদৈবিকে উন্নীত করা ; কুমারী মেরী হলেন প্রকৃতির প্রতীক ; যীশুখৃস্ট হলেন মানবদেহে ভগবানের আত্মা ; তিনি একদিকে যেমন ভগবানের পুত্র, তেমনি আবার মানবপুত্র।"

ভারতীয় ও ইয়োরোপীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে রাজনারায়ণ বসু এবং তাঁর জামাতা কৃষ্ণধন ঘোষ সম্পূর্ণ বিপরীত মতামত পোষণ করতেন। ১৮৬১ খৃস্টাব্দ থেকেই রাজনারায়ণ বসু কলিকাতার ইঙ্গবঙ্গ সমাজকে দেশীয় সংস্কৃতি ও রীতিনীতির দিকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছিলেন। তিনি তাদের বাংলা ভাষায় কথা বলতে ও লিখতে উৎসাহ দেন। ইয়োরোপীয় পোশাকের পরিবর্তে ধুতি চাদর পরতে, ভারতীয় খেলাধুলা ও

ব্যায়াম, ভারতীয় চিকিৎসা পদ্ধতি ইত্যাদি অনুসরণ করতে বলেন। জন্মভূমির মহান অতীত ও মহত্তর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁর অগাধ আস্থা ছিল। প্রকৃত দেশপ্রেমিক ছিলেন বলেই ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য তিনি একটি গুপ্ত সমিতিও গঠন করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সমিতির সভ্য ছিলেন। শক্তি প্রয়োগ করে দেশের শত্রু ধ্বংস করতে হবে বলে সদস্যদের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে হত; ডাঃ কৃষ্ণধন ঘোষ তাঁর শ্বশুরের এই মতবাদ বিশ্বাস করতেন না। প্রবল ব্যক্তিত্ব ও নানা গুণের অধিকারী ডাঃ ঘোষ শিক্ষা অর্জনের জন্য বিলাতে যাওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করতেন। তিনি এবারডীন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চিকিৎসাশাস্ত্রে ডিগ্রী নিয়ে চিন্তায়, অভ্যাসে ও আদর্শে সম্পূর্ণ ইংরেজী মনোভাবাপন্ন হয়ে দেশে ফিরে আসেন।

সুতরাং তাঁর ছেলেমেয়েরা পুরোপুরি ইয়োরোপীয় ধরনে মানুষ হয়ে উঠবে ডাঃ ঘোষ তাই চাইতেন। শ্রীঅরবিন্দ শৈশবে ইংরেজী ও হিন্দুস্থানী ভাষায় কথা বলতেন এবং ইংল্যাণ্ড থেকে ফিরে আসার পর মাতৃভাষা শেখেন। ১৮৭৭ খৃস্টাব্দে অরবিন্দ ও তাঁর দুই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে আইরিশ নানদের পরিচালিত দার্জিলিং লরেটো কনভেন্ট স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়। হিমালয়ের ক্রোড়ে অবস্থিত দার্জিলিং-এ তাঁরা যে দুই বছর ছিলেন সে সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। সোনালি ফার্ন গাছে ঘেরা দুই-একটি রাস্তা এবং দুই-একটি ছোটখাটো ঘটনার কথাই শুধু শ্রীঅরবিন্দের মনে ছিল। ছাত্ররা যেখানে ঘুমতো সেখানকার লম্বা একটি ঘর। তাঁর দাদা মনোমোহনের বিছানা ছিল দরজার কাছে। একদিন গভীর রাত্রে কেউ এসে

দরজায় ধাক্কা দিতে থাকে। দরজা খুলতে বলায় মনোমোহন উত্তর দেন, "আমি দরজা খুলতে পারব না, আমি এখন ঘুমুচ্ছি।" একটি স্বপ্ন সম্বন্ধে তিনি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন: "একদিন আমি ঘুমিয়েছিলাম। হঠাৎ দেখলাম বিপুল একটা অন্ধকার আমার দিকে এগিয়ে এসে আমাকে ও সমগ্র বিশ্বকে ঢেকে ফেলল। তার পর থেকে আমি যতদিন ইংল্যাণ্ডে ছিলাম ততদিন পর্যন্ত একটা বিরাট তমসা আমাকে সব সময় ঘিরে থাকত। আমি বিশ্বাস করি আমার মধ্যে যে তামসভাব ছিল তার সঙ্গে ঐ তমসার একটা সম্পর্ক ছিল। আমি যখন ভারতে ফিরে আসছি তখনই এটা চলে যায়।"

ইংল্যাণ্ডে

ম্যানচেস্টারে : ১৮৭৯ থেকে ১৮৮৪ খৃস্টাব্দের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।

বয়স : ৭ - ১২ বছর

১৮৭৯ খৃস্টাব্দে ডাঃ কৃষ্ণধন ঘোষ তাঁর তিন ছেলেকে লেখাপড়া শেখানোর জন্য ইংল্যাণ্ডে নিয়ে যান। ডাঃ ঘোষ তখন রংপুরে ছিলেন। সেখানকার ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ গ্ল্যাজিয়ারের একজন আত্মীয় রেভাঃ উইলিয়াম, এইচ. ড্রুয়েটের তত্ত্বাবধানে তিনি ছেলেদের থাকার ব্যবস্থা করেন। শ্রীঅরবিন্দ রেভাঃ ড্রুয়েটের সঙ্গে পাঁচ বছর ছিলেন। স্টকপোর্ট রোডের কনগ্রিগেশন্যাল চার্চ তথা অক্টাগোনাল চার্চের মিনিস্টার ছিলেন উইলিয়াম ড্রুয়েট। গীর্জার কাছেই ৮৪ নং শেকস্পীয়ার রোডে তিনি বাস করতেন। অরবিন্দের দুই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ম্যানচেস্টার গ্রামার স্কুলে ভর্তি হন। অরবিন্দের বয়স তখন মাত্র সাত বছর ছিল বলে ড্রুয়েটরা তাঁকে বাড়িতেই পড়াতেন। মিঃ ড্রুয়েট ছিলেন ল্যাটিনে সুপণ্ডিত এবং তিনি অরবিন্দকে ইংরেজী ও ল্যাটিন ভাষা শেখান। শ্রীমতী ড্রুয়েট তাঁকে ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক ও ফরাসী ভাষা শেখান। তিনি বাড়িতে থেকে পড়াশুনা করতেন বলে নিজের পছন্দমত বই পড়ার যথেষ্ট সময় পেতেন। এগুলির মধ্যে ছিল বাইবেল, শেকস্পীয়ার, শেলী ও কীট্স্। ঐ শৈশবেই তিনি যে শুধু পদ্য পড়তেন তাই নয়, 'ফক্স্ ফ্যামিলি' পত্রিকার জন্য পদ্যও লিখতেন।

ডাঃ ঘোষ কঠোর নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন যে তাঁর ছেলেরা যেন কোনো ভারতীয়ের সঙ্গে মেলামেশা না করে অথবা কোনো ভারতীয় প্রভাবে না আসে। এই নির্দেশগুলি অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হয়। সুতরাং ভারত সম্পর্কে, দেশের জনসমাজ, তার ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা নিয়ে অরবিন্দ বড়ো হয়ে ওঠেন।

১৮৮০ খৃস্টাব্দের ৫ জানুয়ারি, ইংল্যাণ্ডের ক্রয়ডনে অরবিন্দের ছোটো ভাই বারীন জন্মগ্রহণ করেন।

এক সময়ে একটা মিথ্যা গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে অরবিন্দ খৃস্টধর্ম গ্রহণ করেছেন। একটা ঘটনার জন্যই হয়তো এই গুজব ছড়ায়। সেই ঘটনার কথা, তিনি নিজেই বলেছেন: "আমরা যখন ইংল্যাণ্ডে ছিলাম, তখন কাম্বারল্যাণ্ডে প্রচলিত ধর্মশাসন-বিরোধী ধর্মযাজকগণের একটি সভা হয়। আমরা তখন মিঃ ড্রুয়েটদের বাড়িতে ছিলাম, তাঁর মা আমাদের সেই সভায় নিয়ে যান। প্রার্থনা শেষ হওয়ার পর অত্যন্ত ধর্ম-প্রেমিক কয়েকজন ছাড়া প্রায় সকলেই চলে যান এবং তখনই আলোচনা শুরু হয়। আমার একটুও ভালো লাগছিল না। তখন একজন ধর্মযাজক এসে আমাকে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেন। আমি কোনো উত্তর দিই নি। তখন তাঁরা সকলে চিৎকার ক'রে ওঠেন "ও বেঁচে গেছে, ও বেঁচে গেছে" এবং আমার জন্য প্রার্থনা করতে থাকেন ও ভগবানকে ধন্যবাদ জানাতে থাকেন। তখন প্রশ্নকর্তা ধর্মযাজকটি এসে আমাকেও প্রার্থনা করতে বলেন। আমার প্রার্থনা করার অভ্যাস ছিল না। তবে নেহাত তাঁর সম্মান রক্ষার খাতিরে, শুয়ে পড়ার আগে শিশুরা যেরকম ভাবে প্রার্থনা করে সেইরকম ভাবে প্রার্থনা

করলাম। ঘটনাটি ছিল শুধু এইটুকু। আমি নিয়মিতভাবে গীর্জায় যেতাম না। আমার বয়স তখন প্রায় দশ বছর।"

সেণ্ট পল এবং কেম্‌ব্রিজে অরবিন্দের নাম অরবিন্দ অ্যাক-রয়েড ঘোষ নামে রেজেস্ট্রী করা হয়। ইংল্যাণ্ডে যাওয়ার আগে ১৮৭২ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে অর্থাৎ যে বছরে অরবিন্দ জন্ম-গ্রহণ করেন, সেই বছরে মিস্ এনেট অ্যাকরয়েড নামক একজন ভদ্রমহিলা কলিকাতায় আসেন। তিনি ছিলেন মনোমোহন ঘোষের বান্ধবী এবং শিশুর নামকরণের সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীঅরবিন্দের পিতা ইংরেজগণের জীবনধারণ পদ্ধতি এত ভালোবাসতেন যে শিশুর একটি ইংরেজী নাম হিসেবে মিস্ অ্যাকরয়েডের নামটি নিয়ে নেন। শ্রীঅরবিন্দ পরে "অ্যাকরয়েড" পরিত্যাগ করেন।

সাত বছর বয়সেই শ্রীঅরবিন্দের একটা প্রবল ধারণা হয় যে বিশ্বে একটা বিরাট উত্থান-পতন ও বিপ্লব আসছে এবং তাঁকে তার মধ্যে একটা ভূমিকা নিতে হবে।

১৮৮৪ খৃস্টাব্দের সেপ্টেম্বর থেকে ১৮৯০-এর জুলাই পর্যন্ত
বয়স : ১২ - ১৮ বছর

১৮৮৪ খৃস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে অরবিন্দ ও তাঁর ভাই মনোমোহন সেণ্ট পল স্কুলে ভর্তি হয়ে লণ্ডনে চলে যান। প্রধান শিক্ষক ডাঃ ওয়াকার অরবিন্দের পরীক্ষা নেন এবং ল্যাটিন ও অন্যান্য বিষয়ে তাঁর দক্ষতা দেখে এত সন্তুষ্ট হন যে, তিনি যে পাঁচ বছর সেণ্ট পলে পড়াশুনা করেন, ততদিন তিনি নিজে তাঁর ভালোমন্দ দেখতেন এবং তাঁকে গ্রীক পড়াতেন। অরবিন্দ

প্রাচীন সাহিত্য পাঠ করেন এবং সাহিত্যে বাটারওয়ার্থ দ্বিতীয় পুরস্কার এবং ইতিহাসে বেডফোর্ড পুরস্কার পান। তিনি খুব তাড়াতাড়ি উচ্চতর শ্রেণীগুলিতে উন্নীত হন, কারণ প্রধান শিক্ষক তাঁর ছাত্রদের উন্নতি করার সব রকম সুবিধে দিতেন। অরবিন্দ সেণ্টপলের সাহিত্য সমিতির অনুষ্ঠানগুলিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতেন। ১৮৮৯ খৃস্টাব্দের ৫ নভেম্বর "সুইফ্‌টের রাজনৈতিক মতবাদের" অসংগতি-সম্পর্কিত একটি বিতর্কে বিশেষ যোগ্যতার সঙ্গে অংশ গ্রহণ করেন এবং ১৯ নভেম্বর মিল্টন-সম্পর্কিত একটি বিতর্কে যোগ দেন। সেণ্ট পল স্কুল দিনের বেলায় বসত। তিনি এর মধ্যেই স্কুলের পাঠ্যবিষয়গুলি পড়ে নিয়েছিলেন বলে প্রথম তিন বছর স্কুলের পাঠ তৈরি করার জন্য বেশি সময় লাগত না এবং তার জন্য বেশি পরিশ্রম করা প্রয়োজন মনে করতেন না। সাধারণ বিষয়গুলি বিশেষ করে ইংরেজী পদ্য সাহিত্য ও উপন্যাস, প্রাচীন মধ্য ও আধুনিক ইয়োরোপের ইতিহাস এবং ফরাসী সাহিত্য পাঠেই তাঁর বেশির ভাগ সময় অতিবাহিত হত। ইতালীয়, জার্মান এবং খানিকটা স্পেনীয় ভাষা শিখতেও খানিকটা সময় দিতেন। পদ্য রচনাতেও যথেষ্ট সময় ব্যয় করতেন। লরেন্স বিনিয়ন তাঁর হেকুবার প্রশংসা করতেন।

তিন ভাই কিছুদিনের জন্য মিঃ ড্রুয়েটের মার সঙ্গে ছিলেন, কিন্তু মনোমোহনের সঙ্গে ধর্মবিষয়ে তাঁর মতপার্থক্য হলে তিনি ওদের ছেড়ে চলে যান। তিনি ছিলেন গোঁড়া খৃস্টান। মনে করতেন যে নিরীশ্বরবাদীর সঙ্গে বাস করলে, সেই বাড়ি তাঁর মাথার ওপর ভেঙে পড়বে। পরে বিনয়ভূষণ ও অরবিন্দ দক্ষিণ কেনসিংটন লিবারেল ক্লাবের একটি কক্ষে বাস করতে থাকেন।

বাংলার এককালীন লেঃ গভর্নর সার হেনরি কটনের ভাই মিঃ জে. এস. কটন ছিলেন সেই ক্লাবের সেক্রেটারি এবং বিনয় তাঁর কাজে সাহায্য করতেন। মনোমোহন ভাড়া-বাড়িতে চলে যান, পরে অবশ্য অরবিন্দও কেম্‌ব্রিজে বাস করতে থাকেন।

বাবা নিয়মিতভাবে টাকা পাঠাতেন না বলে শ্রীঅরবিন্দকে স্কুল জীবনে বহু কষ্ট সহ্য করতে হয়। পুরো এক বছর ধরে সকালে দুই-এক টুকরো রুটি মাখন আর এক কাপ চা এবং বিকেলে এক পেনির রুটি খেয়ে দিন কাটাতেন।

এই ভয়ানক আর্থিক দুর্দশার সময় তাঁরা যাঁদের সঙ্গে থাকতেন তখনকার দুইজন ল্যাণ্ডলেডির সহানুভূতিশীলতা সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দ বলেন যে, আমাদের ল্যাণ্ডলেডি ছিলেন দেবীর মতো। তিনি সম্ভবত বিধবা হওয়ার পর সমারসেট থেকে লণ্ডনে এসে বাস করতে থাকেন। তিনিও বহু কষ্টে ব্যয় নির্বাহ করতেন এবং মাসের পর মাসও যদি আমরা টাকা না দিতাম, তবুও তিনি চাইতেন না। তিনি যে কী করে চালাতেন তা আমরা ভেবে পেতাম না। আমরা এই রকম দু'জন ল্যাণ্ডলেডি পেয়েছিলাম। অন্যজনও আমাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতেন। আমার আই. সি. এস.-এর বৃত্তি থেকে আমি তার ঋণ পরিশোধ করি।

১৮৯০ খৃস্টাব্দের অক্টোবর থেকে ১৮৯২ পর্যন্ত

বয়স : ১৮ - ২০ বছর

বছরে ৮০ পাউণ্ডের উচ্চতর প্রাচীন সাহিত্যের বৃত্তি পেয়ে শ্রীঅরবিন্দ লণ্ডনের সেণ্ট পল বিদ্যালয় থেকে কেম্‌ব্রিজের কিংস

কলেজে ভর্তি হন। তিনি বিশেষ সম্মানের সঙ্গে প্রথম বিভাগে ক্ল্যাসিক্যাল ট্রাইপস পরীক্ষায় পাস করেন এবং এক বছরে গ্রীক ও ল্যাটিন পদ্যে সমস্ত পুরস্কার পান। তিনি কেম্‌ব্রিজ থেকে গ্র্যাজুয়েট হন নি। ট্রাইপসের প্রথম অংশে বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে (প্রথম বিভাগে) পাস করেন। এই প্রথম অংশে পাস করলেই সাধারণত বি. এ. ডিগ্রী দেওয়া হয় কিন্তু সেজন্য তৃতীয় বছরে পরীক্ষা দিতে হয়। অরবিন্দ দুই বছরেই তা পাস করেন। এই রকম ক্ষেত্রে ডিগ্রীর জন্য চতুর্থ বছরে ট্রাইপসের দ্বিতীয় অংশের জন্য পরীক্ষা দিতে হয়। ডিগ্রী পাওয়ার অন্যতম উপায় ছিল এর জন্য আবেদন করা, কিন্তু তিনি তা করেন নি। শিক্ষকতা করার জন্যই অবশ্য ইংরেজীর ডিগ্রী মূল্যবান মনে করা হয়।

বৃত্তি পরীক্ষায় অরবিন্দের প্রাচীন সাহিত্যের পরীক্ষক ছিলেন বিখ্যাত ও. বি. (অস্কার ব্রাউনিং)। এই পরীক্ষায় শেক্‌সপীয়ার ও মিল্টনের তুলনামূলক একটি রচনা লিখতে হয়। একদিন কিংস কলেজের একটি কক্ষে অরবিন্দের সঙ্গে অস্কার ব্রাউনিং এর দেখা হয়। তিনি তাঁকে বলেন, "পরীক্ষায় যে তুমি অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে পাস করেছ তা হয়তো তুমি জানো। আমি তেরোটি পরীক্ষার উত্তরপত্র দেখেছি কিন্তু তোমার মতো এত সুন্দর উত্তর এ পর্যন্ত আমি একটিও পাই নি। তোমার রচনাটি চমৎকার হয়েছিল।" তারপর হয়তো কৌতূহলী হয়ে তিনি অরবিন্দকে তার বাসস্থানের কথা জিজ্ঞাসা করেন। উত্তর শুনে ও. বি. আঁৎকে উঠে বলেন, "ঐ রকম একটা বিশ্রী জায়গায়?"

অরবিন্দের বাবা অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। রংপুরে থাকার

সময় সকলেই তাঁর কথা শুনত। রংপুরের ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ গ্লাজিয়ার তাঁর খুব অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। তিনি বদলী হয়ে যাওয়ায় আর-একজন ইংরেজ তাঁর জায়গায় আসেন। কিন্তু ডাঃ ঘোষের এত প্রভাব তাঁর মনঃপূত হল না। সুতরাং তাঁকে অন্যত্র বদলী করার জন্য তিনি সরকারকে অনুরোধ জানালেন। সরকার তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী ডাক্তার-বাবুকে খুলনায় বদলী করলেন। এখানেও ডাঃ ঘোষ অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন কিন্তু যেভাবে তাঁকে বদলী করা হয় তাতে তিনি অত্যন্ত আঘাত পান। ইংরেজদের সুবিচার সম্পর্কে তিনি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন এবং ইংরেজ-আধিপত্যের বিরোধী হয়ে ওঠেন। এ পর্যন্ত পাশ্চাত্ত্যের সব-কিছুই তাঁর কাছে ভালো মনে হত। তাঁর ছেলেরা যাতে ইংরেজী শিক্ষায় সাফল্য লাভ করে, তাই ছিল তাঁর আশা। তা ছাড়া ঐ সময়ে আই. সি. এস. হওয়াটাকে জীবনের চরম সাফল্য মনে করা হত।

১৮৯০ খৃস্টাব্দে অরবিন্দ আই. সি এস. পরীক্ষায় পাস করেন, তারপর দুটি পিরিয়ডিক্যাল পরীক্ষা ও ডাক্তারী পরীক্ষায় পাস করেন। তিনি অবশ্য আই. সি. এস. হওয়ার জন্য মোটেই উৎসুক ছিলেন না, তবে এই কাজ পাওয়ার কোনো সুযোগ হারানোটা তাঁর পিতামাতা পছন্দ করবেন না বলে জানতেন। আই. সি. এস.-এ ঢুকতে হলে ঘোড়ায় চড়ার পরীক্ষায় পাস করা বাধ্যতামূলক ছিল। এই পরীক্ষা না দেওয়ার সোজা পথটা বেছে নিয়ে অরবিন্দ নিজেকে অযোগ্য বলে প্রমাণিত করলেন। এই ক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে যে অনেক প্রার্থীর বেলার এমনও হয়েছে যে একটা শর্তে তাদের আই. সি. এস.-এ নিয়ে নেওয়া হয়েছে। তা হল, চাকরিতে

থাকাকালে যে-কোনো সময় ঘোড়ায় চড়ার পরীক্ষায় পাস করে নিলেই হত। তবে এই চাকরি না হওয়ায় তিনি নিজে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। সিভিল সার্ভিস কমিশন মন্তব্য করেন যে "ঘোড়ায় চড়ার পরীক্ষায় উপস্থিত হওয়ার জন্য মিঃ এ. এ. ঘোষকে কয়েকবার অনুরোধ জানানো সত্বেও তিনি নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হন নি, এই অবস্থায় তাঁকে আই. সি. এস.-এ নিযুক্ত করার উপযুক্ত বলে সুপারিশ করা যায় না।" ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে প্রবেশাধিকার অবরুদ্ধ হওয়ার আর-একটা কারণ, তাঁর ব্যক্তিগত ফাইলে লর্ড কিম্বার্লির একটি মন্তব্যেরও উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি ঐ সময়ে ভারতের স্বরাষ্ট্র-সচিব ছিলেন এবং তিনি হয়তো অরবিন্দের জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে খবর রাখতেন। ঐ মন্তব্যে বলা হয়েছিল— "মিঃ ঘোষ এই সার্ভিসে বাঞ্ছনীয় কিনা সে সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।" তবে অরবিন্দ এই চাকুরিতে যোগ দিতে উৎসাহী ছিলেন না বলে উভয় পক্ষই সন্তুষ্ট ছিলেন।

ভারতে বৃটিশ সরকারের নির্দয় মনোভাব সম্পর্কে তিক্ত অভিযোগ জানিয়ে ডাঃ ঘোষ ইংল্যাণ্ডে তাঁর ছেলেদের কাছে চিঠি লিখতেন, মধ্যে মধ্যে ভারতীয় সংবাদপত্রগুলি থেকে মুদ্রিত সংবাদ কেটে কেটে পাঠাতেন। এই-সংবাদ, ভারতে বৈদেশিক শাসনের বিরুদ্ধে অরবিন্দকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। তবে দেশের মুক্তি-সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করা সম্পর্কে তিনি কয়েক বছর পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কেমব্রিজে ভারতীয় মজলিসের সদস্য হিসেবে অরবিন্দ অনেক বিপ্লবাত্মক বক্তৃতা দেন। পরে তিনি এই মজলিসের সেক্রেটারি হন। ভারতীয়

সিভিল সার্ভিসে তাঁকে না নেওয়ার মূলে হয়তো এই-সব ব্যাপার কর্তৃপক্ষকে প্রভাবিত করে।

তিনি ও তাঁর ভাই বিনয় লণ্ডনে একটি ভারতীয় বিপ্লবী-দলের পক্ষ হয়ে ভারতীয় রাজনীতির অন্যতম উদারনৈতিক নেতা দাদাভাই নৌরজীর বিরুদ্ধে প্রায়ই বিক্ষোভ প্রদর্শন করতেন। ইংল্যাণ্ডে থাকার সময় শেষের দিকে অরবিন্দ লণ্ডনের ভারতীয়গণের একটি সভায় যোগ দেন। তাতে "পদ্ম ও ছোরা" এই নামে একটি গুপ্ত সমিতি গঠিত হয়। এর সদস্যগণ প্রতিজ্ঞা করেন যে মাতৃভূমি থেকে বিদেশী শাসন অপসারিত করার জন্য প্রত্যেকেই কিছু-না-কিছু কাজ করবেন। সমিতি যদিও বেশিদিন টেঁকে নি তবুও কয়েকজন সদস্য তাঁদের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন অরবিন্দ।

অরবিন্দ যখন ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের অযোগ্য বলে বিবেচিত হন, তখন বরোদার গাইকোয়ার লণ্ডনে ছিলেন। স্যার হেনরি কটনের ভাই, অরবিন্দকে তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন এবং এর ফলে তিনি গাইকোয়ার সরকারে একটি চাকরি পেয়ে যান। এই চাকরিতে যোগ দেওয়ার জন্য তিনি ১৮৯৩ খৃস্টাব্দে ইংল্যাণ্ড থেকে ভারতে রওয়ানা হন।

যে বয়সে মন সহজেই প্রভাবিত হয় সেই সময়টা অরবিন্দ এইরকম ভাবে দার্জিলিং-এর কনভেণ্ট স্কুলে ও ইংল্যাণ্ডে কাটান। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম সংগঠিত করা, দেশ-বাসীকে তাদের জাতীয় সংস্কৃতি এবং বিশ্বে ভারতের ভূমিকা সম্পর্কে সজাগ করার নেতৃত্ব নিয়েই যেন তিনি ২১ বছর বয়সে মাতৃভূমিতে ফিরে এলেন।

অনেকেই মনে করতে পারেন যে ইংল্যাণ্ডে চৌদ্দ বছর কাটিয়ে আসার পর অরবিন্দের ইংরেজী সংস্কৃতি ও জীবনধারা সম্পর্কে একটা মোহ গড়ে ওঠা স্বাভাবিক। এই প্রশ্নটি সম্বন্ধে তাঁর নিজের মন্তব্য হ'ল "দ্বিতীয় দেশ হিসেবে ইয়োরোপের কোনো জায়গা সর্ম্পর্কে তাঁর যদি মনের দিক থেকে কোনো টান থাকে তা হলে সেটি হল ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড নয়। তবে সেই ফ্রান্স তিনি দেখেন নি বা সেখানে থাকেন নি।"

এদিকে দেশে ডাঃ কৃষ্ণধন ঘোষ তাঁর ছেলের প্রত্যাবর্তনের আশায় উন্মুখ হয়েছিলেন কিন্তু ছেলেকে তিনি দেখে যেতে পারেন নি। তাঁকে ভুল খবর দেওয়া হয় যে ইংল্যাণ্ড থেকে যে জাহাজে অরবিন্দ ফিরে আসছিলেন সেটি পর্তুগালের উপকূলে ডুবে গেছে। ডাঃ ঘোষ যখন এই খবর পেলেন তখন তিনি ভাবলেন যে তাঁর ছেলেও ডুবে মারা গেছে। পুত্রবৎসল পিতা এই আঘাত সহ্য করতে না পেরে মারা যান। যে জাহাজটি ডুবে যাওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছিল তা অবশ্য সত্য ছিল, তবে অরবিন্দ সেই জাহাজে ছিলেন না। তিনি আসলে মেইল স্টিমার "কার্থেজে" ক'রে ইংল্যাণ্ড থেকে রওয়ানা হন। পথে এই জাহাজটিও ভীষণ ঝড়ে পড়ে তবে ১৮৯৩ খৃস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম দিকে নিরাপদে বোম্বাই বন্দরে পৌছায়।

বোম্বাইয়ের অ্যাপোলো বন্দরে দেশের মাটিতে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতমাতা তাঁকে এক স্মরণীয় উপায়ে স্বাগত জানান। তিনি লিখেছেন যে, এক বিপুল শান্তি তার ওপর নেমে আসে এবং কয়েক মাস ধরে তাঁকে ঘিরে রাখে। তিনি তাঁর এক শিষ্যের কাছে লেখেন যে "বোম্বাই অ্যাপোলো বন্দরে

নামার পর থেকে আমি দিব্য অভিজ্ঞতা লাভ করতে থাকি কিন্তু সেগুলি এই জগতের বহির্ভূত নয়। সেগুলি অন্তরের গভীরতম অনুভূতি। আমি যেন বাইরের বিশ্বে, বিশ্বের সর্ব-বস্তুতে সেই অনন্তকে ওতপ্রোতভাবে জড়িত দেখতে পাই।”

বরোদা

১৮৯৩ খৃস্টাব্দের ৮ ফেব্রুয়ারি শ্রীঅরবিন্দ বরোদা রাজ্য সরকারের কাজে যোগ দেন। কাগজে কলমে তিনি ১৯০৭ খৃস্টাব্দের ১৮ জুন পর্যন্ত বরোদা রাজ্য সরকারের কাজে নিযুক্ত থাকলেও রাজনৈতিক কাজে ব্যস্ত থাকায় তিনি ১৯০৬ খৃস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত এবং ১৯০৬ খৃস্টাব্দের ১২ জুন থেকে ১৯০৭ খৃস্টাব্দের ১২ জুলাই পর্যন্ত ছুটিতে ছিলেন।

প্রথমে তিনি জরীপ মীমাংসা বিভাগে মাসিক ২০০ টাকা বেতনে কাজ শুরু করেন। পরে তাঁকে টিকেট ও রাজস্ব বিভাগে নিয়োগ করা হয়। তিনি কিছুদিন বরোদার স্বরাষ্ট্র দপ্তরেও কাজ করেন।

মহারাজা তাঁর ব্যক্তিগত কাজ যেমন গুরুত্বপূর্ণ চিঠিপত্রের খসড়া তৈরি করা, চিঠি ও নথীপত্রের সংক্ষিপ্তসার তৈরি করা, এমন-কি, চুক্তির খসড়াও তৈরি করাতেন। একবার কিছুদিনের জন্য মহারাজার সঙ্গে কাশ্মীরে যাওয়া ছাড়া তিনি তাঁর একান্ত সচিবের কাজ করেন নি। বাপাত মামলা এবং সে সম্পর্কে বিচার বিভাগীয় মতামতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তৈরি করার জন্য শ্রীঅরবিন্দকে বিশেষভাবে উটকামণ্ডে পাঠানো হয়।

বিখ্যাত ঐতিহাসিক জি. এস সরদেশাই তাঁর "সয়াজিরাও গাইকোয়ার ইয়াঞ্চিয়া সহাবসত" নামক পুস্তকে শ্রীঅরবিন্দের উল্লেখ করেছেন :

"আমি এবং শ্রীঅরবিন্দ প্রায়ই সয়াজি-রাওয়ের সঙ্গে থাকতাম....কখনও কখনও শ্রীঅরবিন্দের মতো মানুষ তাঁর জন্য বক্তৃতা তৈরি করে দিতেন... একবার মহারাজার একটি

সামাজিক সম্মেলনে বক্তৃতা দেওয়ার কথা ছিল এবং শ্রীঅরবিন্দ তাঁর বক্তৃতা তৈরি করে দেন। আমরা তিনজন (অর্থাৎ মহারাজ, সরদেশাই ও শ্রীঅরবিন্দ) একসঙ্গে বসে সেটি পড়ি। মহারাজা বক্তৃতাটি শুনে বলেন, "আপনি এটা আর-একটু সহজ করতে পারেন না অরবিন্দবাবু? লোকেরা এটাকে আমার বক্তৃতা বলেই মনে করবে না।" শ্রীঅরবিন্দ হাসতে হাসতে উত্তর দেন, "শুধু শুধু কেন বদলাবেন? মহারাজা, আপনি কি মনে করেন যে এটাকে যদি আর-একটু সহজ করা যায় তা হলেও লোকেরা একে আপনার লেখা বলে বিশ্বাস করবে? ভালো মন্দ যাই হোক, লোকেরা সব সময়েই বলবে যে, মহারাজা সব সময়েই অন্যকে দিয়ে নিজের ভাষণ লিখিয়ে নেন। প্রধান কথা হ'ল চিন্তাধারাটা আপনার মতের সঙ্গে মেলে কিনা। সেইটেই আপনার প্রধান অংশ।" সরদেশাই আরো বলেছেন যে, "ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড কার্জন এবং মহারাজার মধ্যে, ভারত সরকার ও বরোদা সরকারের মধ্যে যে-সব চিঠিপত্রের আদান-প্রদান হয় তার বেশির ভাগের খসড়া শ্রীঅরবিন্দ তৈরি করে দেন। চিঠিপত্র দেখে মনে হয় যে মহারাজা যখন প্যারিসে ছিলেন তখন সরকার তাঁকে জানান যে লর্ড কার্জন বরোদা পরিদর্শনে আসতে পারেন এবং তিনি যেন দেশে ফিরে আসেন। তিনি দেশে ফিরে আসতে পারেন নি বলে লর্ড কার্জন অপমানিত বোধ করেন।" সরদেশাই আরো লিখেছেন যে "ঐ সময়ে আমি শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে বেড়াতে যেতাম। তিনি বিশেষ কথাবার্তা বলতেন না, গম্ভীর থাকতেন। প্রশ্নের জবাব তিনি "হ্যাঁ" বা "না" দিয়েই সারতেন, তার বেশি যেতেন না— তিনি কিছুটা দুর্জ্ঞেয় ছিলেন।

প্রশাসনিক রীতিনীতি শ্রীঅরবিন্দ মানতেন না। মহারাজা তাঁর কার্যদক্ষতার প্রশংসা করলেও তাঁকে আরও নিয়মানুবর্তী ও পরিশ্রমী হতে পরামর্শ দেন।

১৯০০ খৃস্টাব্দে তাঁকে ইংরেজীর অধ্যাপক হিসেবে বরোদা কলেজে বদলী করা হয় এবং ১৯০১ খৃস্টাব্দে তিনি শ্রীভূপালচন্দ্র বসুর কন্যা মৃণালিনীকে বিবাহ করেন।

আংশিক সময়ের জন্য বরোদা কলেজে ফরাসী ভাষা অধ্যাপনা করার জন্য শ্রীঅরবিন্দকে বলা হয়। নিজের রাজনৈতিক কাজ করার উদ্দেশ্যে ১৯০৩ খৃস্টাব্দে তিনি এক মাসের ছুটি নেন। ছেলেদের পড়ায় যাতে ক্ষতি না হয় সেজন্য যাওয়ার আগে তিনি ছাত্রদের বাড়িতে ফরাসী ভাষার অতিরিক্ত ক্লাস নেন। ১৯০৪ খৃস্টাব্দে তিনি কলেজের ভাই-প্রিন্সিপ্যাল নিযুক্ত হন।

তাঁর অধ্যাপকতা সম্পর্কে আলোচনাকালে একবার শ্রীঅরবিন্দ বলেন যে "আমি মনোমোহনের মতো তেমন ন্যায়পরায়ণ অধ্যাপক ছিলাম না। আমি কোনো সময়ে নোট দেখতাম না এবং কখনও কখনও আমার ব্যাখ্যা সেগুলির সঙ্গে একেবারেই মিলত না। আমি ছিলাম ইংরেজীর অধ্যাপক, কখনও কখনও ফরাসী ভাষাও পড়াতাম। আমার কাছে এটা আশ্চর্য লাগত যে আমি যা বলতাম ছাত্ররা তাই টুকে নিয়ে মুখস্থ করত। ইংল্যাণ্ডে এরকম ব্যাপার কিছুতেই ঘটতে পারত না। বরোদায় ছাত্ররা আমার নোট নেওয়া ছাড়াও যদি জানতে পারত যে বোম্বাইয়ের কোনো অধ্যাপক তাদের পরীক্ষক হবেন তা হলে তার নোটও মুখস্থ করত। একবার আমি সাদি-র "নেলসনের জীবনী" সম্পর্কে লেকচার দিই।

আমার ব্যাখ্যার সঙ্গে নোটবইয়ের ব্যাখ্যা মিলছিল না বলে ছাত্ররা আপত্তি জানায়। আমি বলি যে "আমি নোট বই পড়ি নি তা ছাড়া আমি সেগুলিকে বাজে ব্যাখ্যা বলে মনে করি।" যাই হোক সমস্ত ছাত্রই তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করত। তাঁর অন্যতম ছাত্র শ্রীকে. এম. মুন্সী বলেছেন যে, "১৯০২ খৃস্টাব্দে আমি যখন ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাস করে বরোদা কলেজে ভর্তি হই তখনই প্রথম আমি শ্রীঅরবিন্দের সংস্পর্শে আসি। এর আগেও একবার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎলাভের সৌভাগ্য হলেও কলেজে এসে শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কে এত গল্প শুনি যে যখনই তিনি ইংরেজীর অধ্যাপক হিসেবে কলেজে আসতেন তখন অতি বিস্ময়ে তাঁর কথার প্রতিটি শব্দ কান পেতে শুনতাম।"

শ্রীঅরবিন্দ বরোদার সংস্কৃত, মারাঠি, গুজরাটি ও বাংলা শিখতে আরম্ভ করেন। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি বাংলায় মধুসূদনের কবিতা ও বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা বুঝতে ও উপভোগ করতে সক্ষম হন। তিনি উপনিষদ্, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত এবং কালিদাস, ভবভূতি ও অন্যান্যের রচনা পড়েন। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি এবং ভারতীয় সব-কিছুর প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণবশতই এগুলি ঘটছিল। মধ্যে মধ্যে যখন তিনি কিছুদিনের জন্য বৈদ্যনাথে গিয়ে তাঁর আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে থাকতেন তখনও তিমি ট্রাঙ্ক বোঝাই বই সঙ্গে নিয়ে যেতেন। তাঁর আত্মীয়া বাসন্তীদেবী লিখে গেছেন যে "অরোদা দুই-তিনটে ট্র্যাঙ্ক নিয়ে আসতেন এবং আমরা ভাবতাম যে এগুলির মধ্যে নিশ্চয়ই খুব দামী দামী স্যুট এবং সেণ্ট ইত্যাদি আছে। আমি বাক্স খুলে অবাক হয়ে যেতাম। সাধারণ কয়েকটি পোশাক

ছাড়া বাক্স বোঝাই খালি বই আর বই। অরোদাদা কি এতগুলি বই পড়তে চান? আমরা ছুটির সময়ে হৈ-চৈ করে কাটাতে চাই আর অরোদাদা সেই ছুটিতেও পড়তে চান? কিন্তু তিনি পড়তে ভালোবাসেন বলেই সঙ্গে বই নিয়ে আসেন। তবে তার মানে এই নয় যে তিনি একেবারেই হৈ-চৈ করতেন না। তাঁর কথাবার্তা সব সময়েই চাতুর্য ও হাসিতে ভরা থাকত।"

তিনি পড়তে খুব ভালোবাসতেন এবং বিভিন্ন বিষয়ের বই পেলেই সঙ্গে সঙ্গে পড়তে আরম্ভ করতেন। তিনি বোম্বাইয়ের দুটি পুস্তকালয়কে নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন যে নতুন কোনো বই এলেই তাঁকে যেন সেগুলির তালিকা পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তাঁর কাছে প্রায়ই বাক্স বোঝাই বই আসত আর বন্ধুরা দেখে অবাক হতেন। এই-সব বইয়ের দাম দেওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি প্রতি মাসে তাঁর মাইনের কিছুটা অংশ আলাদা করে রাখতেন। কেরোসিনের বাতি জ্বালিয়ে তিনি হয়তো শেষ রাত্রি পর্যন্ত মশার কামড় উপেক্ষা করে এবং অনেক সময়ে টেবিলে রেখে দেওয়া খাবার খেতে ভুলে গিয়ে পড়তে থাকতেন। সকালে খাবার খেয়ে, স্নান, খাওয়া এবং কাজে যাওয়ায় আগে পর্যন্ত আবার পড়তেন বা লিখতেন। ইংল্যাণ্ডে বহুদিন থাকা সত্ত্বেও জীবনের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী যে তাঁর বদলায় নি তা খাদ্য পোশাক ও অন্যান্য ব্যাপারে ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। তিনি সব বিষয়ে অত্যন্ত সাদাসিধে ছিলেন, এমন-কি, অসুবিধে বোধ করলেও তা অগ্রাহ্য করতেন। ঘরের ছাদ দিয়ে জল পড়লেও তিনি দৃক্‌পাত করতেন না বা লোহার খাটে তোষক ছাড়া শুতেও অসুবিধে হত না। পড়াশুনার ক্ষেত্রেও বাছাবাছি

ছিল না। হোমার দান্তে ও হোরেস যেমন ঔৎসুক্য নিয়ে পড়তেন, সংস্কৃত সাহিত্যের বেলাতেও তাই।

১৮৯৫ খৃস্টাব্দে 'সঙ্গস্‌ টু মারটিল এবং অন্যান্য কবিতা' এই নামে শ্রীঅরবিন্দের কবিতাবলী প্রকাশিত হয়। এই কবিতা-সমূহের কতকগুলিতে ইয়োরোপীয় সংস্কৃতি ও পরিবেশের প্রভাব বুঝতে পারা যায় আবার অন্যগুলিতে ভারত ও ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর প্রথম প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। 'উর্বশী' এবং 'প্রেম ও মৃত্যু' এই দুইটি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ পদ্য বরোদায় রচিত হয়। মহাকাব্য 'সাবিত্রী' সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দ এই সময়েই প্রথম ভাবতে থাকেন।

একজন যুবা বাঙালী সাহিত্যিক দীনেন্দ্রকুমার রায় ১৮৯৯ খৃস্টাব্দে শ্রীঅরবিন্দকে বাংলা ভাষা এবং বাংলা ভাষায় কথাবার্তা বলতে শেখান। এর পরিবর্তে দীনেন্দ্রকুমার তাঁর কাছ থেকে জার্মান ও ফরাসী ভাষা শিখতে চেষ্টা করেন। দুই বছর তারা একসঙ্গে ছিলেন। 'শ্রীঅরবিন্দ প্রসঙ্গে' নামক পুস্তকে দীনেন্দ্রকুনার তাঁর উদ্দেশে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন—"দিন রাত্রি সব সময়ে আমি তাঁর সঙ্গে থাকতাম। আমি যতই তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসি ততই বুঝতে পারি যে তিনি এই পৃথিবীর মানুষ নন— তিনি অভিশাপবদ্ধ কোন দেবতা।"

"স্বরাজ" এই শব্দটি ছিল ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের লক্ষ্য ও শ্লোগান। শ্রীঅরবিন্দও এই শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এর একটা রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক তাৎপর্য আছে। বাংলা দেশবাসী একজন মারাঠি লেখক দেউস্কর তাঁর 'দেশের কথা' নামক বাংলা পুস্তকে, সম্পূর্ণ জাতীয় মুক্তির রাজনৈতিক লক্ষ্য

হিসেবে এই শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। এই পুস্তকে তিনি বৃটিশ শোষণ এবং দেশবাসীর শোচনীয় দারিদ্র্য সম্পর্কে মর্মন্তুদ বিবরণ দেন! এই বইটি বাংলাদেশে বিপুল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এবং যুব বাংলার মনে গভীর রেখাপাত করে এবং স্বদেশী আন্দোলন গঠনে অন্য সব-কিছুর চাইতে বেশি সাহায্য করে। সরকার যথারীতি শঙ্কিত হয়ে পড়েন এবং বইটি নিষিদ্ধ করে দেন। এইখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে প্রাচীন শাস্ত্রে স্বরাজ কথাটি আধ্যাত্মিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। শ্রীঅরবিন্দ স্বরাজ শব্দটি রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক উভয় অর্থেই ব্যবহার করেন। ১৯০৮ খৃস্টাব্দের ২ মার্চ শ্রীঅরবিন্দ 'বন্দেমাতরম'-এ লেখেন যে "ভারত হল জাতিসমূহের গুরু, মানুষের আত্মার গুরুতর রোগের চিকিৎসক। ভারতকেই আবার বিশ্বে নতুন জীবন প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এবং মানব-আত্মাকে পুনরায় শান্ত করতে হবে। কিন্তু তা করতে হলে স্বরাজ প্রয়োজন এবং এই স্বরাজ অর্জন করতেই হবে।"

শ্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিক আদর্শ ও কর্মপন্থার তিনটি দিক ছিল :

ক. যে কাজ প্রথমে আরম্ভ করেন ; গুপ্ত বৈপ্লবিক প্রচার-কার্য এবং সশস্ত্র বিদ্রোহের প্রস্তুতি হিসেবে সংগঠন।

খ. তিনি যখন রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন তখন বেশির ভাগ ভারতবাসী মনে করতেন যে স্বাধীনতা লাভ করা অসম্ভব, এর জন্য সংগ্রাম করা পাগলামি ছাড়া আর-কিছুই নয়। সুতরাং সমগ্র জাতিকে স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে প্রচারকার্য চালানো। ঐ সময়ে দেশবাসী মনে করতেন যে বৃটিশ সাম্রাজ্য অত্যন্ত শক্তিশালী এবং ভারত

অত্যন্ত দুর্বল এবং অস্ত্রহীন। সুতরাং এই রকম কোনো প্রচেষ্টার কথা স্বপ্নেও কল্পনা করা যায় না।

গ. অসহযোগিতা ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের মাধ্যমে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ বিরোধিতা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে জনগণকে সংগঠিত করা। শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিচেরীতে চলে আসার পরও, স্বরাজ অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত তাঁরই প্রদর্শিত পথে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন গড়ে ওঠে।

ইংল্যাণ্ড থেকে ফিরে আসার ছয় মাস পর ১৮৯৩ খৃস্টাব্দের অগাস্ট মাসে শ্রীঅরবিন্দ, পুনার একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা ইন্দু প্রকাশে' কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। 'পুরানোর পরিবর্তে নতুন আলো' এই নামে প্রবন্ধগুলি প্রকাশ করা হয়। জাতীয় আন্দোলন সম্পর্কে এগুলিতেই তিনি সর্বপ্রথম প্রকাশ্যভাবে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেন। পত্রিকাটির সম্পাদক কে. জি. দেশপাণ্ডে একুশ বছর বয়স্ক শ্রীঅরবিন্দকে এই বলে পরিচয় করিয়ে দেন :

"বর্তমান কালের একজন অত্যন্ত সক্ষম ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন পর্যবেক্ষক, আধুনিক রাজনৈতিক অগ্রগতি সম্পর্কে কয়েকটি প্রবন্ধ আমাদের পত্রিকার প্রকাশ করবেন বলে কিছুদিন পূর্বে আমরা পাঠকদের কথা দিয়েছিলাম। এই পর্যায়ের প্রথম প্রবন্ধটি আমরা পাঠকদের উপহার দিতে পারায় অত্যন্ত আনন্দ লাভ করেছি। এই প্রবন্ধ পর্যায়ের নাম হল 'পুরাতনের পরিবর্তে নতুন আলো'। এগুলিতে যে মতামত ব্যক্ত হয়েছে তার সঙ্গে আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের মতের মিল নেই এবং সেইজন্যই এগুলির বিশেষ মূল্য রয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি যে রাজনৈতিক অগ্রগতি সম্পর্কে আমাদের প্রচেষ্টায় ভাঁটা

পড়েছে এবং উৎসাহের অভাব ঘটেছে। আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলনে কপটতা পাপ প্রবেশ করেছে। সোজা, সত্য সমালোচনার বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলির ভিত্তি দৃঢ় নয় এবং যে-কোনো সময়ে সেগুলি ভেঙে পড়তে পারে। রাজনৈতিক অগ্রগতির পথে আমাদের সমস্ত উৎসাহ যখন ভুল পথে চলেছে তখন এই অবস্থায় চুপ করে থাকা শুধু আলসেমি নয়, তা পাপ। এই সমস্যাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এটা এখন জাতি গঠন বা জাতির মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়ার প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং একজন সুপণ্ডিত, উদারমনোভাবাপন্ন, অভিজ্ঞ, সুলেখক তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁর মতামত ব্যক্ত করবেন। এই প্রবন্ধগুলির প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়ার জন্য আমরা পাঠকগণকে অনুরোধ জানাচ্ছি। এগুলি পাঠ করলে তাঁদের চিন্তাশক্তি জাগ্রত হবে এবং তাঁদের স্বদেশ-প্রেমিক মনে সাড়া জাগাবে।

১৮৯৩ খৃস্টাব্দের ৯ অগাস্ট থেকে এই প্রবন্ধরাজি প্রকাশিত হতে শুরু করে। এগুলি দেশে একটা সাড়া জাগায়। ১৮৯৪ খৃস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এগুলি প্রকাশিত হয়। এখানে কয়েকটি উদ্‌ধৃতি দেওয়া হচ্ছে :

"আমি কংগ্রেস সম্পর্কে এই কথা বলি যে— এর লক্ষ্য ভুল, এই সংগঠন যে মনোভাব নিয়ে তার উদ্দেশ্য সফল করতে চাইছে তার মধ্যে ঐকান্তিকতা নেই, যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হচ্ছে তা সঠিক নয়, এটি যে নেতাদের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে তাঁরা নেতা হওয়ার উপযুক্ত নন—

সংক্ষেপে বলতে গেলে আমরা এখন অন্ধদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছি— এবং তারা অন্ধ না হলেও অন্ততপক্ষে একচক্ষু-বিশিষ্ট।”

“স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধি দিয়ে আমাদের অবস্থা সম্পর্কে একটা পরিষ্কার মনোভাব গড়ে তুলে, অতি বিচক্ষণতার সঙ্গে যতটা সম্ভব সাফল্য লাভ করা যায় তাই হ'ল রাজনীতির সমগ্র লক্ষ্য, কিন্তু সেখানেই আমরা ব্যর্থ হয়েছি।”

“আন্তরিকতাই হ'ল শক্তি এবং সেখানেই আমাদের অভাব।”

“যতদিন পর্যন্ত এই মনোভাব বজায় থাকবে ততদিন পর্যন্ত আমরা বুঝতে পারব না যে জরা ও অবসাদগ্রস্ত এই জাতীয় চরিত্রকে পুনরুজ্জীবিত করা অতি চমৎকার কোনো মেসিনের পক্ষেও সম্ভব নয় এবং বাইরের কোনো শক্তির ওপর নির্ভর না করে ভেতর থেকে শুরু করা কতখানি প্রয়োজন।”

“আমাদের মধ্যে যাঁরা কায়িক পরিশ্রম করেন তাঁরা অজ্ঞতায় ডুবে আছেন। আমরা পছন্দ করি আর না করি আমাদের একমাত্র আশা এবং ভবিষ্যতের একমাত্র ভরসা এঁদের মধ্যেই নিহিত।”

এই প্রবন্ধগুলি রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। এই পত্রিকাটির সঙ্গে সংযুক্ত মহারাষ্ট্রের অন্যতম বিখ্যাত নেতা

মহাদেব গোবিন্দ রানাডে, দেশপাণ্ডেকে সতর্ক করে দেন যে তিনি রাজদ্রোহের দায়ে অভিযুক্ত হতে পারেন। দেশপাণ্ডে বেকাদায় পড়ে শ্রীঅরবিন্দকে অনুরোধ করেন যে তিনি যেন সমালোচনার সুর আর একটু নরম করেন অথবা—অপেক্ষাকৃত নরম সুরে অন্য কিছু লেখেন। এই অবস্থায় শ্রীঅরবিন্দ এই প্রবন্ধমালা লেখার সমস্ত উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন। এর পরিবর্তে তিনি রাজনীতির ব্যাবহারিক দিকটা পরিত্যাগ করে রাজনীর্তির তত্ত্ব সম্পর্কিত প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেন, কিন্তু তাতেও তিনি শীঘ্রই বিরক্ত হয়ে পড়েন।

দেশের প্রকৃত অবস্থা যাতে আরও সুষ্ঠুভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করে কর্তব্য স্থির করা যায় সেজন্য শ্রীঅরবিন্দ দেশের পরিস্থিতি বিশেষভাবে পর্যালোচনা করেন। ১৮৯৮-৯৯ খৃস্টাব্দে তিনি প্রথম ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। তিনি ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক একটি বাঙালী যুবককে বরোদা সরকারের সৈন্যবাহিনীতে ভর্তি করান, পরে তিনি নিরালম্ব স্বামী নামে পরিচিত হন। ভারতের মুক্তি সম্পর্কে একটা কর্মসূচী নিয়ে যতীন বাংলাদেশে ফিরে যান। বিশেষ কতকগুলি উদ্দেশ্যে যেমন সাংস্কৃতিক, নৈতিক বা জ্ঞানমূলক চর্চার জন্য যুব সমিতি গঠন করা হবে এবং যে-সব সমিতি রয়েছে সেগুলিকে বৈপ্লবিক উদ্দেশ্যে পুনর্গঠিত করা হবে। সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরিশেষে যাতে সাহায্য করতে পারে সেইরকমভাবে যুবকদের শিক্ষিত করে তুলতে হবে। এই পরিকল্পনা সহজেই গৃহীত হয়।

ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য গঠির্ত একটি গুপ্ত সমিতির একজন সদস্যের সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ সাক্ষাৎ করেন এবং

পরে সমিতির প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন। বোম্বাইতে অবস্থিত এই সমিতির পরিষদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়।

বারীন ১৯০১ খৃস্টাব্দে বরোদায় আসেন এবং বৈপ্লবিক কাজের জন্য তাঁকে তৈরি করতে শ্রীঅরবিন্দ একটা সুযোগ পান। বারীনও গুপ্ত সমিতিতে যোগ দেন। এক হাতে তরবারি এবং অন্য হাতে গীতা নিয়ে তিনি প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন যে "আমার দেহে যতদিন প্রাণ আছে এবং ভারতমাতা যতদিন পর্যন্ত না শৃঙ্খলমুক্ত হচ্ছেন ততদিন আমি বিপ্লবের কাজ চালিয়ে যাব। যদি আমি কোনো সময়ে এই সমিতির একটি কথা বা একটি ঘটনাও প্রকাশ করি অথবা কোনোরকমে এর ক্ষতি করি তা হলে আমার জীবন দিয়ে তার মূল্য দিতে হবে।"

ভারতের স্বাধীনতা শ্রীঅরবিন্দের কাছে রাজনৈতিক খেলা ছিল না, পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য স্থাপনের তা ছিল প্রথম পদক্ষেপ। বরোদা তাঁর সদর দপ্তর হলেও সমগ্র ভারতে বিশেষ করে বাংলা, গুজরাট ও মহারাষ্ট্রে তাঁর রাজনৈতিক কর্ম-প্রচেষ্টা ব্যাপৃত ছিল।

পি. মিত্র এবং বিপ্লবী দলের অন্যান্য নেতাদের, এই গুপ্ত সমিতি এবং এর লক্ষ্য সম্পর্কে জ্ঞাত করানোর উদ্দেশ্যে শ্রীঅরবিন্দ ১৯০২ খৃস্টাব্দে বাংলাদেশে যান। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে সন্ত্রাসবাদ এই সমিতির কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল না। কিন্তু ঐ প্রদেশে যে কঠোর দমননীতি চলছিল এই দমননীতির প্রতিক্রিয়া হিসেবেই সন্ত্রাসবাদ গড়ে ওঠে। ঐ বছরেই শ্রীঅরবিন্দ আমেদাবাদে কংগ্রেস সম্মেলনে যোগ দেন। তিলক ঐ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

তিনি তাঁকে প্যাণ্ডেলের বাইরে ডেকে নিয়ে গিয়ে, সংস্কার-বাদী আন্দোলন সম্পর্কে ঘৃণা প্রকাশ করে এবং মহারাষ্ট্রে তাঁর নিজস্ব কর্মধারা ব্যাখ্যা করে এক ঘণ্টা ধরে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেন।

১৯০৩ খৃস্টাব্দে শ্রীঅরবিন্দ "আপস নয়" এই নামে একটি পুস্তিকা লেখেন এবং বিপ্লবী দলের একজন সদস্য অবিনাশ, গোপনে তা মুদ্রিত করেন।

১৯০৪ খৃস্টাব্দে শ্রীঅরবিন্দ বোম্বাইয়ের কংগ্রেস সম্মেলনে যোগ দেন, এতে সভাপতিত্ব করেছিলেন স্যার হেনরি কটন। স্যার হেনরি, বৃটিশ সাম্রাজ্যের উপনিবেশ হিসেবে 'ভারত যুক্তরাষ্ট্র' গঠনের পক্ষে মত প্রকাশ করেন। শ্রীঅরবিন্দ সব সময়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষপাতি ছিলেন। এই বছরেই শ্রীঅরবিন্দ, চারুচন্দ্র দত্ত, আই. সি. এস.-এর সঙ্গে দেখা ক'রে 'ভবানী মন্দির ঘোষণাপত্র' তাঁকে বুঝিয়ে বলেন। শ্রীঅরবিন্দ এটি রচনা করেন এবং একে জাতীয় আন্দোলনের বাইবেল বলা যায়। শ্রীদত্ত বিপ্লবী দলে যোগ দেন। জি. ডি. মাদগাওঙ্কার ছিলেন আর একজন আই. সি. এস. যিনি পশ্চিম ভারতে শ্রীঅরবিন্দের বিপ্লবী কর্মপ্রচেষ্টার প্রধান সমর্থক ছিলেন। এখানে সেই ঘোষণাপত্রের কয়েকটি উদ্ধৃতি দেওয়া হল :

"আমরা যতই গভীরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি ততই আমরা বুঝতে পারি যে আমাদের একটা জিনিসের অভাব আছে আর সেটা অর্জনের জন্য আমাদের সর্বপ্রথমে চেষ্টা করতে হবে। সেটা হল শক্তি— শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি, নৈতিক শক্তি এবং সর্বোপরি আত্মিক শক্তি। এই শক্তিই হ'ল সমস্ত

শক্তির উৎস। এই উৎসের ক্ষয় নেই। আমাদের যদি শক্তি থাকে তা হলে অন্য সব-কিছু সহজে ও স্বাভাবিকভাবেই আসবে। শক্তির অভাবে আমরা স্বপ্নাবিষ্ট মানুষের মতো হয়ে আছি। স্বপ্নাবিষ্টের যেমন হাত থাকতেও তা দিয়ে ধরতে পারে না, আঘাত করতে পারে না, পা থাকতেও দৌড়াতে পারে না, শক্তিহীন মানুষও তাই।"

"আধুনিক জাপানে শক্তির যে হঠাৎ অতি বিপুল প্রকাশ ঘটেছে ইতিহাসে তার তুলনা নেই। এই বিপুল বিকাশের মূল কারণ হিসেবে অনেক রকম ব্যাখ্যা দেওয়া হচ্ছে কিন্তু শিক্ষাপ্রাপ্ত জাপানিগণ আমাদের সেই শক্তির উৎস, সেই বিপুল জাগরণের উৎসের কথা এখন বলছেন। এই উৎসের ভিত্তি হ'ল ধর্ম। এটা হ'ল দায়োমির বেদান্তবাদ এবং শিন্টো-বাদের পুনরুত্থান। মিকাডোকে জাপানীরা জাতীয় শক্তির প্রতীক হিসেবে পূজো ক'রে এই ক্ষুদ্র দ্বীপ সাম্রাজ্যটি অর্জুন যেমন গাণ্ডীব পরিচালনা করতেন তেমনি সহজ ও সঠিকভাবে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানের বিপুল অস্ত্র পরিচালনায় সক্ষম হয়েছে।"

'ভবানী মন্দির'-এর পরিশিষ্টে, কী কাজ করতে হবে এবং কী নীতি অনুসরণ করতে হবে তা বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে।

১৯০৫ খৃস্টাব্দে শ্রীঅরবিন্দ বারাণসীর কংগ্রেস সম্মেলনে যোগ দেন, সভাপতিত্ব করেন গোপালকৃষ্ণ গোখলে। তিনি প্রকাশ্য অধিবেশনে উপস্থিত থাকেন নি তবে জাতীয় আন্দোলনের নেতাগণ তাঁর কাছে এসে পরামর্শ নিতেন এবং সেই অনুযায়ী কাজ করতেন।

সব রকম প্রতিবাদ সত্ত্বেও ১৯০৫ খৃস্টাব্দের ১৬ অক্টোবর বাংলা ভাগ হ'ল এবং তা দেশে বিপুল বিক্ষোভের সৃষ্টি করে। 'বন্দে মাতরম্' চিৎকারে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে। সরকার সঙ্গে সঙ্গে 'বন্দে মাতরম্' বলা নিষিদ্ধ করে দেন। কিন্তু তাঁরা যা আশা করেছিলেন ফল হ'ল তার বিপরীত। এটা জাতির মন্ত্রে পরিণত হয়।

১৮৮২ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্র-রচিত 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে একটি গানের মূল কথা হ'ল 'বন্দেমাতরম্'। এই উপন্যাসে বিদ্রোহী সন্ন্যাসীরা, মুসলমান অত্যাচারী ও বৃটিশ ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে এই গানটি গায়। এই গানটি বর্তমানে স্বাধীন ভারতের দুটি জাতীয় সংগীতের অন্যতম।

শ্রীঅরবিন্দ যদিও নিজেকে সোজাসুজি ও সক্রিয়ভাবে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে যুক্ত করেন, তবুও বরোদা সরকারের কাজ থেকে পদত্যাগ করেন নি বলে তিনি যেন পর্দার আড়াল থেকে কাজ করছিলেন।

বাংলাদেশ.

১৯০৫ খৃস্টাব্দের বাংলা বিভাগকে শ্রীঅরবিন্দ আশীর্বাদ বলে মনে করেন। জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে তিনি সোজাসুজি প্রত্যক্ষভাবে যোগ দেন।

১৯০৬ খৃস্টাব্দের ১৪ এপ্রিল, শ্রীঅরবিন্দ বরিশাল সম্মেলনে যোগ দেন। সরকার এই সম্মেলনকে বেআইনি বলে ঘোষণা করেন। এই ঘোষণার প্রতিবাদে একটি মিছিল বের করা হয় এবং তার নেতৃত্ব করেন শ্রীঅরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র পাল ও বি. সি. চট্টোপাধ্যায়। এই মিছিলের ওপর লাঠি চালানো হয় এবং কয়েকজন আহত হন। এর পর তিনি বিপিনচন্দ্র পালের সঙ্গে বাংলাদেশ পরিভ্রমণে বের হন এবং অসংখ্য সভার ব্যবস্থা করা হয়। একটি জেলায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিষেধবিধি অগ্রাহ্য করে সভা করা হয়।

১৯০৬ খৃস্টাব্দের মার্চ মাসে বারীনের পরামর্শ অনুযায়ী 'যুগান্তর' নামে একটি বাংলা সাপ্তাহিক প্রকাশ করতে শুরু করা হয়। প্রথম দিকে শ্রীঅরবিন্দ নিজে এটির জন্য কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন এবং সাধারণভাবে এটি পরিচালনা করেন।

'যুগান্তর' প্রকাশ্য বিদ্রোহের পথ অবলম্বন করার কথা প্রচার করত, এমন-কি, গেরিলা যুদ্ধ সম্পর্কে নির্দেশাদি প্রচার করত। যখন এটির অন্যতম সহকারী সম্পাদক (স্বামী বিবেকানন্দের অন্যতম ভ্রাতা) অভিযুক্ত হন তখন 'যুগান্তর' বৃটিশ সরকারকে স্বীকার করে না বলে কোনো বৃটিশ আদালতে স্বপক্ষ সমর্থন করতে পর্যন্ত অস্বীকৃত হয়।

স্বাধীনতা অর্জন না করা পর্যন্ত দেশ যে জাতীয় কর্মসূচী অনুসরণ করে তা এই সময়েই সর্বপ্রথম গৃহীত হয়। ভারতে রাজনৈতিক কর্মসূচীর লক্ষ্য 'পূর্ণ স্বরাজ'-এর পক্ষে শ্রীঅরবিন্দই সর্বপ্রথম প্রকাশ্যভাবে দাঁড়ান। স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার, বিদেশী জিনিস বর্জন, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ, অসহযোগিতা, জাতীয় শিক্ষা, আপসে আইন সম্পর্কিত বিরোধ মীমাংসা ইত্যাদির স্বপক্ষে তিনি কতকগুলি প্রবন্ধ লেখেন। দেশবাসী উৎসাহের সঙ্গে এগুলি অনুসরণ করে।

১৯০৬ খৃস্টাব্দের অগাস্ট মাসে শ্রীঅরবিন্দ মাসিক মাত্র ১৫০ টাকা বেতনে কলিকাতার জাতীয় কলেজের (বর্তমানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) প্রথম অধ্যক্ষ হিসেবে কাজ করেন। জাতীয় শিক্ষা পরিষদ এই কলেজ স্থাপন করেন।

১৯০৬ খৃস্টাব্দের অগাস্ট মাসে অন্যতম জাতীয় নেতা বিপিনচন্দ্র পাল 'বন্দেমাতরম্' নামে একটি নতুন সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। তিনি শ্রীঅরবিন্দকে এর সম্পাদনার কাজে সাহায্য করতে অনুরোধ করেন। শ্রীঅরবিন্দ তা করতেই শুধু স্বীকৃত হলেন না, তিনি কলিকাতার জাতীয় নেতাগণের একটি সভা আহ্বান করলেন এবং তাঁরা 'বন্দেমাতরম্'কে তাঁদের দলীয় পত্রিকা বলে গ্রহণ করলেন। শ্রীঅরবিন্দ পরে এর সম্পাদক হিসেবে কাজ করেন কিন্তু তাঁর নাম মুদ্রিত হত না। এটি প্রায় দুই বছর ধরে চলে। শ্রীঅরবিন্দ যখন জেলে ছিলেন তখন সরকার এর প্রকাশ বন্ধ করে দেন। পত্রিকাটি আর্থিক দুরবস্থায় পড়ে যায় এবং সম্পাদকরা চাইছিলেন যে সসম্মানে এটির প্রকাশ যদি বন্ধ হয়ে যায় তা হলে ভালো হয়। সুতরাং সরকার যাতে আইনগত কর্মপন্থা গ্রহণ করতে উৎসাহী হন

সেজন্য তাঁরা ইচ্ছে করে একটি উত্তেজনামূলক প্রবন্ধ পত্রিকাটিতে প্রকাশ করেন।

এই সময়ে শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁর সহযোগীরা কলিকাতার কংগ্রেস সম্মেলনে যোগ দেন, তাতে সভাপতিত্ব করেন দাদাভাই নৌরজী। কংগ্রেস ইতিহাসে সেইবারই সর্বপ্রথম স্বরাজ দাবি ক'রে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। জাতীয়তাবাদীরা পরিষ্কারভাবে দাবি জানান যে স্বরাজের অর্থ সম্পূর্ণ স্বাধীনতা। ইংল্যাণ্ডে একজন ইংরেজ অথবা আমেরিকায় একজন আমেরিকান যেমন সমস্ত রকম বৈদেশিক নিয়ন্ত্রণ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, দেশবাসী সেই রকম মুক্তি চায়। কিন্তু উদারপন্থীরা একে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন বলে বর্ণনা করেন।

একজন পাঠকের উত্তেজনাকর সরকার বিরোধী রচনা প্রকাশ করা হয়েছে এই অজুহাতে ১৯০৭ খৃস্টাব্দের ২৪ জুলাই শ্রীঅরবিন্দ এবং বিপিনচন্দ্র পাল অভিযুক্ত হন। বিচারে তাঁরা শাস্তি পাবেন এটা যখন প্রায় নিশ্চিত হয়ে ওঠে তখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর বিখ্যাত অরবিন্দকে "নমস্কার" কবিতাটি লেখেন। কিন্তু আদালত যখন বিপিন পালকে সম্পাদকের নাম জানাতে বলে তখন তিনি তা প্রকাশ করতে অস্বীকৃত হন। এই আদালত-অবমাননার জন্য তাঁর ছয় মাসের জেল হয়। যাই হোক, বিপিন পাল নাম প্রকাশ করতে অস্বীকৃত হওয়ায় শ্রীঅরবিন্দই যে সম্পাদক ছিলেন তা প্রমাণ হল না এবং তিনি মুক্তি পান।

১৯০৭ খৃস্টাব্দের নভেম্বর মাসে শ্রীঅরবিন্দ বঙ্গীয় জাতীয় কংগ্রেসের মেদিনীপুর সম্মেলনে এবং পরে হুগলী সম্মেলনে জাতীয় দলের নেতৃত্ব করেন। সব সময়েই তিনি পূর্ণ স্বাধীনতার

ওপর জোর দেন এবং এটা ছিল তাঁর সংহত বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গীর একটা অংশ ; তিনি মনে করতেন যে বিশ্বের জাতিসমূহের মধ্যে ভারতের একটা ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে এবং লেখেন যে "এই আন্দোলনের পেছনে একটা ঐশী শক্তি রয়েছে। একটা বিপুল উত্থানপতন ঘটানোর জন্য সময় শক্তি কাজ করছে এবং বর্তমান অবস্থায় জগতের পক্ষে তা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। এটা হ'ল এশিয়ার পুনরুত্থানের আন্দোলন এবং এই ব্যাপক আন্দোলনে ভারতের পুনরুত্থান শুধু যে একটা প্রয়োজনীয় অংশ তাই নয় এটা হ'ল মৌলিক প্রয়োজন। ভারত হল, এশিয়ার সাধারণ ভাগ্যের উত্তরাধিকারীর প্রতীক একটি খিলানের মূল প্রস্তর··· স্বাধীন ও ঐক্যবদ্ধ ভারতের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং ঋষিগণের এই বাস-ভূমিতে তা পূর্ণ রূপ নিয়েছে। বিশ্বের যে আধ্যাত্মিক শক্তির প্রয়োজন একটা মহান সভ্যতার সেই শক্তি তাকে শক্তিদান করছে।" এই ছিল তাঁর স্বপ্ন। ইংল্যাণ্ড বা ইংরেজ জাতির প্রতি তাঁর কোনো ঘৃণা ছিল না।

১৯০৭ খৃস্টাব্দে ২৬ ডিসেম্বর শ্রীঅরবিন্দ বিখ্যাত সুরাট কংগ্রেসে যোগ দেন। জাতীয়তাবাদী ও উদারপন্থীদের মধ্যে মত-পার্থক্য বেড়ে চলেছিল। কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবটিকে কেন্দ্র করেই বিভেদ বাড়তে থাকে। জাতীয়তাবাদীরা সেই প্রস্তাবটিকে ভিত্তি করে কর্মসূচী রূপায়িত করতে চান। উদারপন্থীরা ১৯০৬ খৃস্টাব্দে প্রস্তাবটি বাধ্যতামূলক ব'লে মানতে রাজি ছিলেন না। অভ্যর্থনা সমিতিতে তাঁদের সংখ্যাধিক্য ছিল, সুতরাং জাতীয়তাবাদীরা সেটি প্রকাশ্য অধিবেশনে উত্থাপন করার প্রস্তাব করেন।

সভাপতি নির্বাচন নিয়ে গোলমাল শুরু হয়। সুরেন্দ্রনাথ ডাঃ রাসবিহারী ঘোষের এবং তিলক লালা লাজপত রায়ের নাম প্রস্তাব করেন। উদারনৈতিক দলের স্বেচ্ছাসেবকরা রেগে গিয়ে তিলককে মারার জন্য একটা চেয়ার তোলে; জাতীয়তাবাদীর মঞ্চের দিকে একটা জুতো ছুঁড়ে মেরে সেদিকে এগিয়ে যেতে থাকে; গোলমাল চলতে থাকে এবং উদারপন্থী দল, শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে পুলিশ ডাকে।

শ্রীঅরবিন্দ একবার একটি ব্যক্তিগত চিঠিতে লেখেন, "খুব কম লোকই জানেন যে (তিলকের সঙ্গে আলোচনা না করে) আমিই আদেশ দিই যার ফলে কংগ্রেস বিভক্ত হয়ে যায়।

আলীপুর মামলা

উত্তর কলিকাতার মানিকতলা বাগানে শ্রীঅরবিন্দের একটি পারিবারিক সম্পত্তি ছিল। বারীন সেখানে বিপ্লবীদের কেন্দ্র গড়ে তোলেন। সেখানে তাঁরা বৈপ্লবিক পুস্তকাদি ও গীতা পাঠ করতেন, ধ্যান অভ্যাস করতেন এবং বোমা বানানো সম্পর্কে পরীক্ষাদি করতেন। উল্লেখ করা যেতে পারে যে সন্ত্রাসবাদ শ্রীঅরবিন্দের লক্ষ্য ছিল না, তাঁর লক্ষ্য ছিল সমগ্র ভারতে প্রকাশ্য বিদ্রোহ।

জাতীয়তাবাদীদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে সরকার খুব শঙ্কিত হয়ে পড়েন। কঠোর শাস্তির ভয় দেখিয়ে বিপ্লবীদের বশীভূত করার চেষ্টা করেন। কলকাতার অন্যতম প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ কিংসফোর্ড, সুশীল সেন নামক ১৫ বছরের একটি ছেলেকে তাঁর সামনে বেত মারার নির্দেশ দেন এর ফলে সুশীল অজ্ঞান হয়ে যায় এবং অর্ধমৃতের মতো পড়ে থাকে। বিপ্লবীরা একে যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ বলে গ্রহণ করে। ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকি প্রতিশোধ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। গোলমালের সম্ভাবনা বুঝে কিংসফোর্ড মুজাফরপুরে বদলী হয়ে যান। এই দুজন যুবক তাঁকে অনুসরণ করেন এবং ১৯০৮ সালের ৩০ এপ্রিল, একটি গাড়ি যখন ক্লাব থেকে বেরিয়ে আসছিল তখন ক্ষুদিরাম সেটিকে লক্ষ্য ক'রে বোমা ফেলেন। তিনি ভেবেছিলেন যে কিংসফোর্ড ঐ গাড়িতে আছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একজন শ্রীমতী কেনেডি ও তাঁর কন্যা সেই গাড়িতে ছিলেন এবং তাঁরা মারা যান। এই খবর পেয়ে শ্রীঅরবিন্দ, বারীনকে বলেন যে মানিকতলা

বাগান থেকে কর্মীদের ও অন্যান্য জিনিসপত্র যেন সরিয়ে ফেলা হয়। বারীন তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী সব জিনিস সরিয়ে না ফেলায় সেই ভুলের ফলভোগ করেন। ১৯০৮ খৃস্টাব্দে ২ মে মধ্য-রাত্রিতে পুলিশের একটি বাহিনী ঐ বাগান ঘিরে ফেলে এবং বোমা অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করে। বারীন ও তাঁর সঙ্গীদের গ্রেফতার করা হয়।

কিংসফোর্ড বা কেনেডিদের ঘটনার ওপর শ্রীঅরবিন্দের কোনো হাত না থাকলেও তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার যে সুযোগ সরকার এতদিন ধরে খুঁজছিলেন এবারে সেই সুযোগ তাঁরা পেলেন। ১৯০৮ খৃস্টাব্দে ৩ মে ভোরবেলা গ্রে স্ট্রীটে তাঁর বাড়ি ঘেরাও ক'রে পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে। তন্ন তন্ন করে তল্লাসী চালিয়ে তাঁর ব্যক্তিগত চিঠিপত্র ইত্যাদি নিয়ে যাওয়া হয়।

শ্রীঅরবিন্দকে লালবাজার থানায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখান থেকে আলীপুর জেলে। বিচারাধীন বন্দী হিসেবে ১৯০৮ খৃস্টাব্দে ৫ মে থেকে তাঁর বন্দী জীবন শুরু হয় এবং পরের বছর ৬ মে তা শেষ হয়।

এইরকমভাবে বিখ্যাত আলীপুর মামলা শুরু হয়। অভিযুক্তের সংখ্যা ছিল ৪৯ জন, সাক্ষীর সংখ্যা ২০৬। ৪০০টি কাগজপত্র এবং বোমা, রিভলভার, কাতুর্জ, ডিটোনেটার, ফিউজ, বিষাক্ত অ্যাসিড ইত্যাদিসহ ৫০০০টি জিনিস আদালতে দেখানো হয়। নরেন্দ্র গোস্বামী নামক একজন অভিযুক্ত স্বীকারোক্তি করে এবং কানাইলাল দত্ত ও সত্যেন্দ্র বসু তাকে গুলি করে মেরে ফেলেন। এর জন্য কানাইলালের ফাঁসি হয়।

যে অতিরিক্ত সেসন জজ শ্রীঅরবিন্দ ও অন্যান্যের বিচার করেন তিনি সি. বি বীচক্রফ্‌ট নামক একজন অসামরিক বিচারপতি। কেম্‌ব্রিজের কিংস কলেজে তিনি ছিলেন শ্রীঅরবিন্দের সহপাঠী। তাঁরা দুজনেই ভালো ছাত্র ছিলেন এবং ফাইন্যাল পরীক্ষায় বন্দী শ্রীঅরবিন্দ, বিচারক বীচক্রফ্‌টকে গ্রীক ভাষার পরীক্ষায় হারিয়ে দিয়েছিলেন। বন্দীদের তারের জালের ভেতরে রাখা হয় এবং পুলিশ বন্দুকে বেয়নেট লাগিয়ে সমস্ত কক্ষটি পাহারা দিতে থাকে। প্রধান অভিযোক্তা ইয়ার্ডলি নর্টন মামলা যতদিন চলে ততদিন পর্যন্ত পাঁচ ঘড়ার একটি রিভলভারে গুলি ভরে তাঁর ব্রীফ্‌ কেসের ওপরে রাখতেন। শ্রীঅরবিন্দকে অভিযুক্ত করার জন্য সর্বপ্রকারে চেষ্টা করা হয়। বীচক্রফ্‌ট তাঁর রায়ের প্রথম ভাগে লেখেন. "এই মামলার প্রধান আসামী অরবিন্দ ঘোষের কথা এখন বলছি। সরকার পক্ষ অন্য সকলের চাইতে তাঁকেই শাস্তি দেওয়ার জন্য বেশি উৎসুক ছিলেন. কিন্তু তিনি কাঠগড়ায় উপস্থিত না থাকলে অনেক আগেই মামলা শেষ হয়ে যেত তাতে কোনো সন্দেহ নাই।"

শ্রীঅরবিন্দের পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন চিত্তরঞ্জন দাশ। তিনি শ্রীঅরবিন্দের বিবৃতি থেকে পড়ে শোনান :

"আপনার কাছে আমার বিরুদ্ধে সমগ্র মামলাটি হ'ল এই। যদি বলা হয় যে আমি আমার দেশে স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার করেছি যা আইন-বিরুদ্ধ তা হলে সেই অভিযোগে আমি দোষী। স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার করা যদি অপরাধ হয় তা হলে আমি স্বীকার করছি যে আমি তা করেছি। আমি

সে সম্পর্কে কখনো আপত্তি জানাই নি। আমি পাশ্চাত্ত্যের রাজনৈতিক দর্শনের নীতিগুলি গ্রহণ করে, বেদান্তের অক্ষয় ও অমর উপদেশগুলির সঙ্গে তা সংযুক্ত করেছি।

"আমি অনুভব করি যে বিশ্ববাসীর কল্যাণে ভারতের একটা ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে এবং দেশবাসী যাতে তা বুঝতে পারে সেজন্য আমার প্রচারকার্য চালাতে হবে।

"সেটাই যদি আমার অপরাধ হয় তা হলে আপনারা আমাকে শৃঙ্খলিত করতে পারেন, বন্দী করতে পারেন। কিন্তু আমার কাছ থেকে কিছুতেই ঐ অভিযোগের অস্বীকৃতি আদায় করতে পারবেন না। আমি সবিনয়ে এ কথাও বলতে চাই যে, স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার করার জন্য আইনের কোনো ধারা অনুযায়ী আমি দোষী নই। তার পর যে-সব কাজ করেছি বলে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে, সে সম্পর্কেও কোনো প্রমাণ নেই। তা ছাড়া আমি যে শিক্ষা দিয়েছি, যা লিখেছি এবং সাক্ষ্যদানকালে আমার যে মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে সেগুলির সঙ্গে এই অভিযোগের কোনো যোগাযোগ নেই।"

চিত্তরঞ্জন দাশ তখন আদালতকে সম্বোধন করে বলেন :

"সুতরাং আপনার কাছে আমার আবেদন হল, এই রকম ব্যক্তির বিরুদ্ধে যে-সব অভিযোগ আনা হয়েছে তিনি শুধু আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে নেই ইতিহাসের উচ্চ আদালতের কাঠগড়াতেও দাঁড়িয়ে আছেন; সেইজন্যই আপনাদের কাছে আমার আবেদন হ'ল, এই বাদানুবাদ, এই গণ্ডগোল, এই আন্দোলন থেমে যাওয়ার অনেক পরে,

তাঁর মৃত্যু হওয়ার অনেক পরেও তাঁকে স্বদেশপ্রেমের কবি হিসেবে, জাতীয়তাবাদের অবতার হিসেবে এবং মানবসমাজের প্রেমিক হিসেবে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হবে, তাঁর মৃত্যুর অনেক পরেও তাঁর বাণীসমূহ কেবলমাত্র ভারতেই নয় বহু দূর সমুদ্রের ওপারে দেশে দেশে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হবে। সেইজন্য আমি বলি, তাঁর মতো একজন ব্যক্তির বিচার শুধু এই আদালতেই হবে না, ইতিহাসের উচ্চ আদালতেও হবে।

"মাননীয় বিচারপতি, আপনার মতামত এবং জুরীর রায় বিবেচনা করার সময় এখন এসেছে। ইংরেজী ইতিহাসের অত্যন্ত উজ্জ্বল অধ্যায় হল ইংরেজদের বিচার ব্যবস্থা। আমি তাঁরই ঐতিহ্যের দোহাই দিয়ে আপনার কাছে আবেদন করছি। যা-কিছু মহান তার নামে ইংরেজদের বিচার-বিভাগ থেকে নিঃসৃত সমগ্র হাজার নীতির নামে আবেদন জানাচ্ছি, যে বিখ্যাত বিচারপতিগণ এমনভাবে আইনের প্রয়োগ করেছেন, যাঁদের রায় অভিযুক্ত অভিযোক্তা উভয়েই মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন, শুধু তাই নয় অভিযুক্তরা সেই রায়কে সম্মান দেখিয়েছেন, সেই বিচারপতিদের নামে আবেদন জানাচ্ছি। ইংরেজী ইতিহাসের উজ্জ্বলতম অধ্যায়ের নামে আবেদন জানাচ্ছি এবং এ কথা কেউ যেন বলতে না পারে যে একজন ইংরেজ বিচারক সুবিচার করতে ভুলে যান।"

তারপর ভারতীয় জুরীগণের দিকে ফিরে চিত্তরঞ্জন দাস বলেন:

"অরবিন্দ যে আদর্শ প্রচার করেন তার নামে এবং আমাদের দেশের সমস্ত ঐতিহ্যের নামে আপনাদের কাছে

আবেদন জানাচ্ছি এবং এ কথা যেন কেউ না বলে যে তাঁর দুইজন দেশবাসী বদ্ধমূল সংস্কার এবং ক্রোধের বশবর্তী হয়ে সাময়িক অভিযোগের কাছে নতি স্বীকার করেন।"

পরিশেষে আদালতের রায় ঘোষণা করা হল: "আমি ১২১, ১২১ক এবং ১২২ ধারা অনুযায়ী নরেন বক্সী, শৈলেন্দ্র কুমার সেন, নলিনীকান্ত গুপ্ত, পূর্ণচন্দ্র সেন, বিজয়কুমার নাগ, কুঞ্জলাল সাহা, হেমেন্দ্রনাথ ঘোষ, ধরণীনাথ গুপ্ত, বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, বিজয় ভট্টাচার্য, হেমচন্দ্র সেন, প্রভাসচন্দ্র দে, দীনদয়াল বসু, নিখিলেশ্বর রায়মৌলিক, দেবব্রত বসু এবং অরবিন্দ ঘোষকে দোষী বলে মনে করি না এবং ১২৩ ধারা অনুযায়ী এঁদের নির্দোষ বলে মনে করি।"

শ্রীঅরবিন্দ এবং উপরি-উক্ত ব্যক্তিরা খালাস পেয়ে যান, অন্যরা অভিযুক্ত হন। বারীন এবং উল্লাসকর মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন, পরে তা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে পরিবর্তিত হয়। ১৯২০ খৃস্টাব্দে অবশ্য তাঁদের মুক্তি দেওয়া হয়।

যোগ

আলীপুর মামলায় নির্দোষ হওয়ার পর এই পৃথিবীতে শ্রীঅরবিন্দের কর্মপ্রচেষ্টার একটি নতুন অধ্যায় শুরু হল। অন্তর থেকে তাঁকে বলা হ'ল যে ভারতের মুক্তি সুনিশ্চিত, দেশের লক্ষ্য ও তার উপায় বলে দেওয়া হয়েছে— এখন তাঁকে পরবর্তী ব্যবস্থা— সমগ্র মানবজাতির মুক্তির জন্য তৈরি হতে হবে। জেলে থাকার সময়েই অন্তরের বাণী শুনতে পান যে, "আমার আর-একটা কাজ তোমাকে করতে হবে এবং সেজন্যই আমি তোমাকে এখানে এনেছি, তুমি নিজে যা শিখতে পার নি তা শেখাব আমার কাজ করার শিক্ষা দেব।"

জেল থেকে মুক্তিলাভ করে উত্তরপাড়ায় তিনি প্রথম ভাষণ দেন। তাতে তিনি বলেন যে "আমি এখন আর জাতীয়তাবাদীকে একটা বিশ্বাস, ধর্ম বা মত বলি না। আমাদের কাছে যা জাতীয়তাবাদ, তাই হল সনাতন ধর্ম; হিন্দুরা সনাতন ধর্ম নিয়েই জন্মগ্রহণ করে, এর সঙ্গেই তারা বিচরণ করে, এর সঙ্গেই বৃদ্ধি পায়। সনাতন ধর্মের অবনতি হলে, জাতিরও অবনতি হয় এবং সনাতন ধর্ম, সনাতন ধর্মের সঙ্গেই ধ্বংস হতে পারে। সনাতন ধর্মই হল জাতীয়তাবাদ। আপনাদের কাছে আমার বাণী হল এই।" ১৯০৯ খৃস্টাব্দে জুন মাসে কর্মযোগীতেও তিনি লেখেন :

"জ্ঞান, প্রেম অথবা কাজের জন্য ভগবানের সঙ্গে যোগাযোগ করাই হল যোগ। যে সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান মানুষের অন্তরে এবং বাইরে সর্বত্র বিরাজ করছেন যোগী তাঁর সঙ্গে প্রত্যক্ষ

যোগাযোগ স্থাপন করে। তিনি অসীমের সঙ্গে সুর মেলান। বিশ্বে করুণা বিতরণের উদ্দেশ্যে ভগবান তাকেই শক্তির আধার করেন। মানুষ যখন নিজের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে অন্যের জন্য জীবন ধারণ করে অন্যের সুখ-দুঃখ নিজের বলে অনুভব করে, যখন ফলের আশা না করে সর্বান্তঃকরণে নিজের কর্তব্য সম্পাদন করে, যখন সে জয়ে উৎফুল্ল বা পরাজয়ে কাতর হয় না; যখন সে সর্ব কর্ম ভগবানের কাছে সমর্পণ করে এবং প্রতিটি বাক্য, চিন্তা ও কার্য ভগবানের বেদীমূলে অর্পণ করে, যখন সে ঘৃণা, ভয় ও আকর্ষণমুক্ত হয় এবং সঠিকভাবে, অবিশ্রান্ত ভাবে ত্বরাবিহীন গতিতে প্রকৃতির শক্তির মতো কাজ করে, এই দেহ, মন, অন্তঃকরণ এগুলি তার নয় অথবা এর সমষ্টিও সে নয় এবং নিজের আসল সত্তা খুঁজে পায়; যখন সে নিজের অমরত্ব এবং মৃত্যুর অসারত্ব উপলব্ধি করে; যখন যে জ্ঞানের আলোক দেখতে পায় এবং বুঝতে পারে যে তার মন বাক্য এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে ঐশী শক্তি অবিরামভাবে কাজ করছে এবং এইরকমভাবে সে যখন তার সব-কিছু সর্বশক্তিমান, মানবের কল্যাণকারীর কাছে অর্পণ করে তখন সে সর্বক্ষণের জন্য ভগবানের সঙ্গে বাস করে, তখন তার দুঃখ, কষ্ট, ভয় উত্তেজনা কিছুই থাকে না— তাই হল যোগ। প্রাণায়াম আসন, মনঃসংযোগ, পূজা, উৎসব, ধর্মানুষ্ঠান যোগ নয়। তবে এগুলি যোগ সাধনার উপায় মাত্র। যোগ খুব একটা কষ্টকর বা বিপজ্জনক পন্থা নয়, অন্তরের নির্দেশ এবং অন্তরে অবস্থিত শিক্ষকের সাহায্যে নিরাপদে ও সহজে যোগাভ্যাস করা যায়। সকলেই স্বাভাবিক শক্তি অনুযায়ী

যোগাভ্যাস করতে সক্ষম। কারণ এমন কোনো মানুষ নেই যার মধ্যে শক্তি বা বিশ্বাস বা প্রেম সুপ্ত বা বিকশিত অবস্থায় নেই। এর যে-কোনো একটাই যোগীর পক্ষে যথেষ্ট। তবে সকলেই অবশ্য এক জীবনে এই পথে সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছতে পারে না. তবে সকলেই এগিয়ে যেতে পারে। ক্ষমতা অনুসারে তারা শান্তি, শক্তি ও আনন্দের অধিকারী হতে পারে। এই ধর্মের সামান্য অংশও মানুষ বা জাতিকে প্রবল ভয় থেকে মুক্ত করতে পারে। আধ্যাত্মিকতা জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। ঈশা উপনিষদে বলা হয়েছে, তোমরা যাতে সব উপভোগ করতে পার সেইজন্য সব পরিত্যাগ করো, অন্যের সম্পদ লাভের বাসনা কোরো না। বিশ্বে তোমার কর্তব্য সম্পন্ন করো এবং শত বৎসর পরমায়ু লাভ করো ; নিজের কর্মফল থেকে মুক্তিলাভের অন্য কোনো উপায় নেই।" ধর্মের উচ্চস্তর এই পৃথিবীর সংগ্রামের বাইরে— এই কথা ভাবা ভুল। শ্রীকৃষ্ণ বার বার অর্জুনকে এই সংগ্রাম করে যেতে বলেছেন। যুদ্ধ করো এবং শত্রুকে পরাজিত করো, আমাকে স্মরণ ক'রে যুদ্ধ করো ; পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিক মন নিয়ে, সমস্ত বাসনা পরিত্যাগ করে, স্বার্থহীন ভাবে সমস্ত কর্ম আমার ওপর অর্পণ করে যুদ্ধ করো, তোমার অন্তরের তাপ চলে যাক।" কোনো ধার্মিক ব্যক্তি যদি তাঁর সাধারণ কাজকর্ম পরিত্যাগ না করেন তবুও তিনি অত্যন্ত সাত্ত্বিক অত্যন্ত ধার্মিক, অত্যন্ত প্রেমিক এবং বাইরের কঠোর জগৎ সম্পর্কে নির্বিকার থাকতে পারেন— এ কথা মনে করা ভুল।

বরোদায় শ্রীঅরবিন্দ যে যোগাভ্যাস শুরু করেন তা

এখন প্রকাশ্য ও প্রত্যক্ষভাবে তাঁর জীবনের সমগ্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল। তাঁর যোগকে তিনি অখণ্ড যোগ বলতেন। এর তিনটি মৌলিক বিষয় রয়েছে, সেগুলি হল— আকাঙ্ক্ষা, সমর্পণ ও প্রত্যাখ্যান।

১৯০৪ খৃস্টাব্দ থেকেই তিনি প্রাণায়াম অভ্যাস করতে থাকেন। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা এইরকমভাবে বর্ণনা করেছেন: "চমৎকার ফল পাওয়া গিয়েছিল। আমি নানা রকম দৃশ্য ও আকার দেখতে পেতাম। আমার রচনাশক্তি প্রায় চলে গিয়েছিল তা বিপুল বেগে আবার ফিরে এল। আমি অনর্গলভাবে পদ্য ও গদ্য লিখতে পারতাম। তার পর থেকে লেখার সেই সাবলীলতা অব্যাহত থাকে। আমি পরে যদি আর-কিছু না লিখে থাকি তার কারণ হ'ল আমি অন্য কাজে ব্যস্ত থাকতাম। কিন্তু যখনই ইচ্ছা হ'ত তখনই লিখতে পারতাম। তৃতীয়তঃ চমৎকার স্বাস্থ্য। আমি বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠলাম, গাত্রচর্ম কোমল ও গৌরবর্ণ হয়ে উঠল এবং মুখের লালাতেও মিষ্টি স্বাদ পেতাম। মাথার চতুর্দিকে একটা জ্যোতি অনুভব করতাম। তখন বহু মশা ছিল কিন্তু সেগুলি আমার কাছে ঘেঁষে নি।"

তিনি আরো কতকগুলি অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেছেন: "তার পর একজন নাগা সন্ন্যাসী এলেন এবং আমাকে কালী স্তোত্র দিলেন, এটির মধ্যে জহিসহ খুব উগ্র মন্ত্র ছিল। আমি এটি বার বার আবৃত্তি করতাম, কিন্তু কোনো ফল পাই নি।"

"আমি. ব্রহ্মানন্দের মৃত্যুর পর কেশবানন্দ যখন ছিলেন তখন গঙ্গানাথে যাই।"

"এই সময়ে আমি মাংস আহার পরিত্যাগ করি এবং নিজেকে খুব হাল্কা ও পবিত্র মনে করতে থাকি।"

"ঐ সময়ে আমার ইউরোপীয় মন দেব-দেবীতে বিশ্বাস করত না। আমি কার্ণালীতে (চান্দোদ) যাই, সেখানে অনেক মন্দির আছে। সেখানে একটি কালী মন্দির আছে। মূর্তির দিকে তাকিয়ে আমার মনে হল সেটির মধ্যে প্রাণ রয়েছে। সেই প্রথম আমার ভগবানের উপস্থিতিতে বিশ্বাস এল।"

"যখন আমি বাংলাদেশে গিয়ে রাজনৈতিক কাজ শুরু করি তখন নিয়মিতভাবে প্রাণায়াম করতে পারতাম না—এর ফলে আমার খুব শক্ত অসুখ হয় এবং আমি প্রায় মারা যাচ্ছিলাম।"

প্রাণায়াম অভ্যাস করার পূর্বে শ্রীঅরবিন্দ যে কতকগুলি আধিভৌতিক অভিজ্ঞতা লাভ করেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ১৮৯৩ খৃস্টাব্দে যখন তিনি ইংল্যাণ্ড থেকে ফিরে এসে অ্যাপালো বন্দরে নামেন তখনই তাঁর মনে হয়েছিল যে একটা বিরাট শান্তি তাঁর মধ্যে যেন নেমে আসছে। এ কথা আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি।

১৯০৩ খৃস্টাব্দে তিনি যখন কাশ্মীর পর্যটন করছিলেন তখন তিনি শঙ্করাচার্য পাহাড়ে যান (যাকে তখ্ত-ই-সুলেমান বলা হয়) তখন প্রত্যক্ষভাবে অসীম শূন্যের অভিজ্ঞতা অর্জন করেন এবং এই অভিজ্ঞতা 'অদ্বৈত' কবিতায় বর্ণনা করেন :

অদ্বৈত

আমি সলোমনের আসনের উচ্চ পথে হাঁটছিলাম,
ওখানেই দাঁড়িয়ে আছে শঙ্করাচার্যের ক্ষুদ্র মন্দির :
পৃথিবীর বিফল কল্পনাশেষের রুক্ষ পর্বতপৃষ্ঠের ওপর—
সময়ের সীমা .থকে সে অসীমের দিকে চেয়ে আছে।
আমার চারি দিকে অবয়বহীন এক শূন্যতা,
চতুর্দিক এক আশ্চর্য নামহীনে পরিণত।
এক অজ্ঞাত বাস্তব বিশ্বনগ্নতা
শীর্ষহীন, অন্তহীন, চিরশান্ত—
যাঁর একমাত্র কথা নিস্তব্ধতা....

১৯০১ খৃস্টাব্দে বারীন যখন প্ল্যানচেট নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছিলেন তখনই শ্রীঅরবিন্দ কতকগুলি অলৌকিক রহস্যের অভিজ্ঞতা লাভ করেন। প্রায় এই সময়ে বারীন ভৌতিক রহস্য সম্পর্কে একটি বই পড়ে প্ল্যানচেটে লেখা ও টেবিল ঠক্ ঠক্ করা নিয়ে পরীক্ষা শুরু করেন। এই পরীক্ষাগুলি যে চিত্তাকর্ষক হয়েছিল, নিম্নলিখিত ঘটনাবলীতে তা বোঝা যাবে :

একবার বারীন তাঁর পিতা ডাঃ কৃষ্ণধন ঘোষকে ডাকেন। উত্তরে বলা হয় যে তিনি সেখানেই আছেন। তখন তাঁর পরিচয় সম্পর্কে কোনো কোনো সংকেত বা প্রমাণ দিতে বলা হয়। বারীন যে তাঁকে একটা সোনার ঘড়ি দিয়েছিলেন তা তাঁকে বলা হয়। বারীন অবশ্য সে কথা একেবারে ভুলে গিয়েছিলেন, এবারে সেই কথা মনে হ'ল। বারীন তখন সেই আত্মাকে তার আরো পরিচয় দিতে

বলায়, শ্রীদেবধর নামক একজন ইঞ্জিনীয়ারের বাড়ির দেওয়ালে একটি ছবির কথা বলে। খোঁজ ক'রে যখন সেই ছবি পাওয়া গেল না তখন ডাঃ কৃষ্ণধন ঘোষের সেই তথাকথিত আত্মাকে আবার জিজ্ঞেস করা হল, উত্তরে আত্মা আরো ভালো করে খোঁজ করতে বলল। তাঁরা আরো ভালো করে খুঁজে দেখলেন যে ছবিটি সত্যিই আছে তবে তার ওপর চুনকাম করা হয়ে গেছে।

২। আর-একবারের বৈঠকে জাতীয়তাবাদী নেতা তিলক উপস্থিত ছিলেন। ডাঃ কৃষ্ণধন ঘোষের আত্মাকে ডেকে বলা হয়, "তিলক কী ধরনের ব্যক্তি।" আত্মা উত্তর দেয় "যখন তোমাদের সমস্ত কাজ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে যাবে এবং অনেকেই তাদের মাথা নোয়াবে. এই ব্যক্তিটি তখনো তার মাথা সোজা রাখবে।"—এটার সত্যতা প্রমাণিত হয়।

৩। একবার রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে ডাকা হয় এবং তাঁকে কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়। কিন্তু তিনি অনেকক্ষণ চুপ করে ছিলেন। যাওয়ার সময় তিনি বলে যান "মন্দির গড়ো, মন্দির গড়ো।"

বরোদায় একবার একটা দুর্ঘটনা কোনো রকমে নিবারিত হয় এবং সেটাও ছিল এক সুন্দর অভিজ্ঞতা। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর গাড়িতে করে ক্যাম্প রোড থেকে শহরের দিকে যাচ্ছিলেন। পার্কের ঠিক পাশেই তিনি একটা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা দেখতে পান। তিনি দেখতে পেলেন যে এটা প্রতিরোধ করার ইচ্ছাশক্তির সঙ্গে নিজের ভেতর থেকেই একটা জ্যোতি বেরিয়ে এসে পরিস্থিতি সামলে নিল।

রোগমুক্তির উদ্দেশ্যে প্রার্থনার ফল শ্রীঅরবিন্দ বর্ণনা

করেছেন : "আমার খুড়তুতো বোন টাইফয়েডে মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছিল। ডাক্তাররা সমস্ত আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন। একমাত্র ভগবানের করুণা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। তখন তাঁরা ভগবানের করুণা প্রার্থনা করতে থাকেন। প্রার্থনার শেষে দেখেন যে ওর জ্ঞান ফিরে এসেছে।

"আর-একটি ঘটনা। একবার মাধব রাওয়ের ছেলে নভসারিতে মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছিল। ডাক্তাররা আশা ছেড়ে দেন। মাধব রাও বাড়িতে টেলিগ্রাম করলেন, ওষুধ-পত্র বন্ধ করে দিয়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করার পরামর্শ দিলেন। প্রার্থনা করার পর ছেলেটি ভালো হয়ে উঠল। এই ঘটনাটির কথা আমি নিজে জানি। মাধব রাও আমাকে টেলিগ্রামটি দেখিয়েছিলেন।"

একবার বারীন অমর কণ্টক পর্বতমালায় পরিভ্রমণের সময় পার্বত্য জ্বরে আক্রান্ত হন। একজন নাগা সন্ন্যাসী মন্ত্রের শক্তিতে তাঁকে রোগমুক্ত করেন। তখনই শ্রীঅরবিন্দ যোগশক্তির প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেলেন। সাধু এক গ্লাস জল নিয়ে মন্ত্র পড়তে পড়তে একটা ছুরি দিয়ে জলটাকে আড়াআড়িভাবে কাটেন। তিনি তার পর বারীনকে সেই জলপান করতে দিয়ে বললেন যে, পরদিন থেকে তার আর জ্বর হবে না। তার পর জ্বর ছেড়ে গেল।

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর স্ত্রী মৃণালিনীর কাছে যে-সব চিঠি লেখেন সেগুলিতেও তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের আভাষ রয়েছে। ১৯০৫ খৃস্টাব্দের ৩০ অগাস্ট তিনি লেখেন :

"দুঃখই হল সমস্ত জাগতিক বাসনার অনিবার্য ফল···

"আমার তিনটি পাগলামি আছে। প্রথম আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভগবান আমাকে যে বিদ্যা, বুদ্ধি, সম্পদ পুণ্য দিয়েছেন সেগুলি সবই তাঁর। পরিবার প্রতিপালনের জন্য যেটুকু অত্যন্ত প্রয়োজন কেবলমাত্র সেইটুকু ব্যয় করার অধিকার আমার।

"কিছুদিন থেকে দ্বিতীয় বোকামিটি আমাকে পেয়ে বসেছে, যে কোনো উপায়ে ভগবানের প্রত্যক্ষ অনুভূতি লাভ করতে হবে। যখন-তখন ভগবানের নাম নেওয়া, সকলের সামনে ভগবানের নাম কীর্তন করা এবং আমি কতখানি ধার্মিক তা লোককে দেখানো এগুলোই এখন ধর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে; আমি এগুলোই চাই না। ভগবান যদি থাকেন তা হলে তাঁর অস্তিত্ব উপলব্ধি করার নিশ্চয়ই একটা উপায় আছে। সেই উপায় যতই কঠিন হোক তা অনুসরণ করার জন্য আমি কঠোর প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছি। হিন্দুধর্ম বলে যে নিজের মধ্য থেকে, নিজের মনের মধ্য থেকেই সেই পথ খুঁজে নিতে হয়। যে নিয়ম সেই পথ অনুসরণ করতে সাহায্য করে তাও আমাকে দেওয়া হয়েছে।

"তৃতীয় বোকামি: অন্যরা দেশকে নির্জীব পদার্থ বলে মনে করে এবং এর মাঠ, ঘাট. অরণ্য, পর্বত. নদী দিয়েই একে চেনে, আমি কিন্তু দেশকে মা বলেই জানি। আমি তাকে মা হিসেবে পূজা করি, মায়ের মতো ভালোবাসি। যখন কোনো রাক্ষস মায়ের বুকের ওপর বসে তার রক্ত পান করতে থাকে তখন ছেলে কী করে? সে কি তখন শান্তভাবে বসে আহারে প্রবৃত্ত হয় এবং স্ত্রী-পুত্র নিয়ে আনন্দে সময় কাটায়, না কি সে মাকে উদ্ধার করার জন্য ছুটে যায়? আমি জানি যে এই পতিত জাতিকে উদ্ধার করার শক্তি

আমার আছে। সেটা দেহের শক্তি নয়। আমি বন্দুক তরবারি নিয়ে লড়াই করব না। জ্ঞানের শক্তি নিয়ে লড়াই করব। যোদ্ধার শক্তিই একমাত্র শক্তি নয়, জ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মশক্তিও রয়েছে। এটা আমার অন্তরের নতুন অনুভূতি নয়, অথবা এক্ষুনি এর উৎপত্তি হয় নি। আমি এটা নিয়েই জন্মলাভ করেছি, এটা আমার মজ্জায় রয়েছে। এই মহান কর্তব্য সম্পাদনের জন্য ভগবান আমাকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন।”

১৯০৭ খৃস্টাব্দে ১৭ ফেব্রুয়ারি স্ত্রীর কাছে তিনি যে চিঠি লেখেন তাতে ভগবানের ইচ্ছার কাছে তাঁর প্রাত্যাহিক জীবন সমর্পণের কথা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন :

“৪ঠা জানুয়ারি তোমার সঙ্গে আমার দেখা করার কথা ছিল। কিন্তু আমি আসতে পারি নি তা আমার অপরাধ নয়। ভগবান আমাকে যেখানে নিয়ে যান সেখানেই আমাকে যেতে হয়। এবারে আমি আমার নিজের কাজের জন্য যাই নি, তাঁর কাজের জন্য গিয়েছিলাম। বর্তমানে আমার মনের অবস্থা সম্পূর্ণ বদলে গেছে। তা আমি এই চিঠিতে ব্যক্ত করতে পারি না। এখানে এসো, তার পর আমার যা বলার আছে তা তোমাকে বলব। এখন আমি যেটুকু বলতে পারি তা হ'ল, এখন থেকে আমি আর আমার নিজের প্রভু নই ; ভগবান যেখানে আমাকে নিয়ে যাবেন সেখানেই আমাকে পুতুলের মতো যেতে হবে ; তিনি আমাকে দিয়ে যা করাবেন পুতুলের মতো আমাকে তাই করতে হবে।”

মৃণালিনী দেবী অবশ্য তাঁর সেই পূর্ণ সমর্পণ দেখে যেতে

অরবিন্দের আনুমানিক এগারো বছর বয়সের ছবি, যখন তিনি ড্রেউইট পরিবারের সঙ্গে ম্যাঞ্চেস্টারে বাস করছিলেন
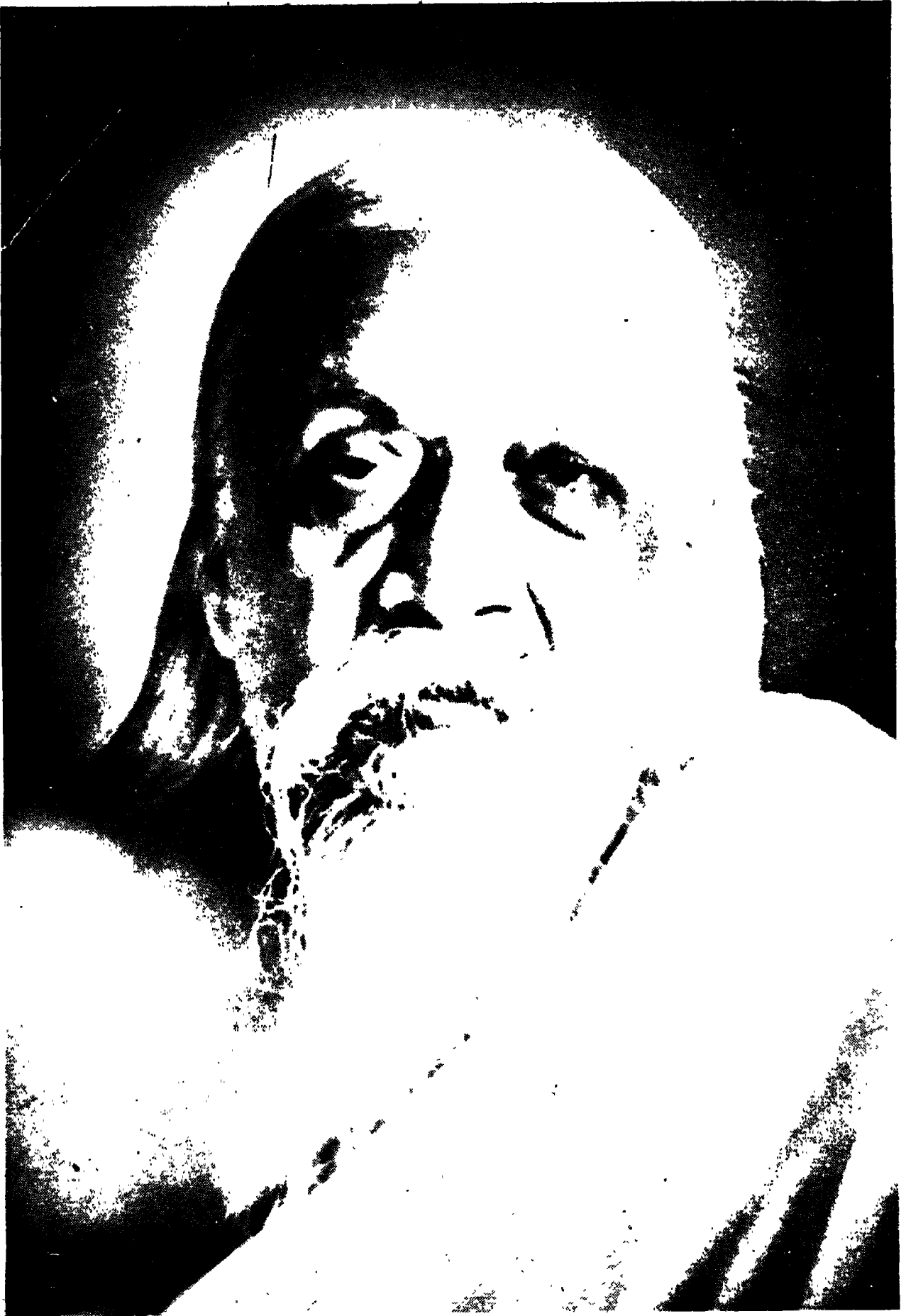
এপ্রিল, 1950 খৃঃ অঃ। দেহত্যাগের আট মাস আগে

পারেন নি। এগারো বছর পর ১৯১৮ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে পণ্ডিচেরী যাওয়ার পথে ইনফ্লুয়েঞ্জায় মারা যান।

১৯০৭ খৃস্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে তিনি বারীনকে জিজ্ঞেস করেন যে তাঁকে যোগ শিক্ষায় সাহায্য করতে পারেন এমন কোনো ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর দেখা করিয়ে দিতে পারেন কিনা। বারীন, বিষ্ণু ভাস্কর লেলে নামক একজন মহারাষ্ট্রীয়ের নাম শুনেছিলেন এবং তিনি তাঁকে বরোদায় আমন্ত্রণ জানান। বরোদার সারদা মজুমদারের বাড়ির ওপর তলার একটা ঘরে শ্রীঅরবিন্দ লেলের সঙ্গে তিনদিন ছিলেন।

লেলে তাঁকে বলেন "বসো, লক্ষ্য করে দেখো যে তোমার চিন্তা বাইরে থেকে তোমার ভেতরে আসছে। তারা ঢোকবার পূর্বেই তাদের পেছনে ঠেলে দাও।" শ্রীঅরবিন্দ ধ্যানে বসে আশ্চর্য হয়ে দেখলেন যে সত্যিই তাই। তিনি দেখলেন এবং সঠিকভাবে অনুভব করলেন যে চিন্তাগুলি যেন মাথার ওপর দিয়ে বা ভেতর দিয়ে ঢোকবার চেষ্টা করছে; এগুলি ভেতরে ঢোকার আগেই প্রতিরোধ করতে সক্ষম হচ্ছেন। তিন দিনে— প্রকৃতপক্ষে বলতে গেলে একদিনের মধ্যেই তাঁর মন একটা চিরন্তন স্তব্ধতায় ভরে উঠল। এটাই ছিল নীরব, নিরলম্ব, সীমাহীন ব্রহ্মের উপলব্ধি। যে চারটি মহান উপলব্ধির ওপর শ্রীঅরবিন্দের যোগ-সাধনা প্রতিষ্ঠিত এটা তার প্রথম। প্রথম উপলব্ধির গোড়ার দিকে তিনি বিশ্বের সমগ্র অবাস্তবতা অনুভব করেন। আলীপুর জেলে দ্বিতীয় উপলব্ধির সময় এই অনুভূতি চলে যায়। তখন তিনি সর্ব বস্তুতে ব্যাপৃত সর্বময় ব্রহ্মার অস্তিত্ব অনুভব করেন।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ১৯০৮ খৃস্টাব্দের পর

যখন তিনি লেলের সঙ্গে ধ্যানস্থ হতেন এবং মনের নীরবতার অবস্থা বুঝতে পারতেন তখন তাঁর সমস্ত কাজকর্ম যেমন লেখা বা বক্তৃতা দেওয়া ইত্যাদি সবই, মন থেকে উচ্চতর স্থানে অবস্থিত কোনো উৎস থেকে নির্গত হত।

১৯০৮ খৃস্টাব্দে ব্রহ্মজ্ঞানে রুদ্ধবাক্ হয়ে তিনি বোম্বাইতে যান। সেখানে তাঁর জাতীয় ইউনিয়নে ভাষণ দেওয়ার কথা ছিল, তিনি লেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আমি কী করব।" লেলে তাঁকে সভায় গিয়ে শ্রোতৃবর্গেকে নারায়ণ মনে করে নমস্কার করতে বলেন, তা হলেই কেউ তাঁর মুখ দিয়ে ভাষণ দেবেন। প্রকৃতপক্ষে সেইরকম ভাবে তাঁর মুখ দিয়ে ভাষণ নির্গত হতে থাকল।

লেলের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার পূর্বে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর কাছ থেকে উপদেশ চাইলেন। লেলে যখন তাঁকে বিশদভাবে সব বোঝাচ্ছিলেন, শ্রীঅরবিন্দ তখন বলেন যে তাঁর মনে একটা মন্ত্রের উদয় হয়েছে। লেলে তাঁকে বলেন যে ভগবান তাঁকে যে মন্ত্রটি দিলেন তিমি যেন সম্পূর্ণভাবে তার ওপরেই নির্ভর করেন এবং তাঁর আর কোনো উপদেশের প্রয়োজন নেই। এইরকম ভাবেই শ্রীঅরবিন্দ তাঁর অন্তরস্থিত ঐশ্বরিক পথ-নির্দেশকের হাতে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করেন। কয়েক বছর পর তিনি লেখেন যে "আমার অন্তরস্থিত ঐশ্বরিক পথ-নির্দেশক আমাকে এগিয়ে চলার জন্য বলতে থাকেন, অভিজ্ঞতার পর অভিজ্ঞতা অর্জিত হতে থাকে, এবং কোনোটাকেই শেষ স্তর বলে মনে না করে সেই অব্যয় অতিরিন্দ্রিয়ের দেখা না পাওয়া পর্যন্ত উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তরে যৈতে থাকল।"

তাঁর বিখ্যাত উত্তরপাড়া বক্তৃতায় আলীপুর জেলের দ্বিতীয় উপলব্ধির কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

"ভগবান জেইলারদের মন আমার দিকে ফিরিয়ে দিলেন এবং তাঁরা জেলের ইংরেজ কর্তাকে বললেন, যে, "ইনি বন্দী অবস্থায় ভীষণ কষ্ট পাচ্ছেন, একে সেলের বাইরে সকালে বিকেলে অন্ততপক্ষে আধঘণ্টা বেড়াবার অনুমতি দেওয়া হোক" সুতরাং তার ব্যবস্থা করা হল ; বাইরে যখন আমি বেড়াতাম তখনই তাঁর শক্তি আমার মধ্যে প্রবেশ করত। যে জেল আমাকে মানুষের সঙ্গ থেকে পৃথক করে রেখেছে, তার উঁচু দেওয়ালে আমি আবদ্ধ নই, বাসুদেব আমাকে ঘিরে রয়েছেন। আমার সেলের কাছে গাছের নীচ দিয়ে যখন হাঁটতাম তখন বুঝতে পারতাম সেটা গাছ নয়, বাসুদেব। আমি দেখতে পেতাম শ্রীকৃষ্ণ সেখানে দাঁড়িয়ে আমার মাথার ওপর তাঁর ছায়া ধরে আছেন। আমার সেলের শূন্যতার দিকে তাকিয়ে দেখি দরজার শিকগুলি বাসুদেব। নারায়ণ সেখানে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছেন। কোচ হিসাবে আমাকে মোটা খস্‌খসে কম্বল দেওয়া হয় তাতে যখন শুতাম তখন মনে হ'ত আমার বন্ধু, আমার প্রেমিক শ্রীকৃষ্ণ আমাকে জড়িয়ে আছেন। ভগবান আমাকে গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়েছেন এইবারই তা প্রথম ব্যবহার করলাম। আমি জেলের বন্দী, তস্কর, খুনী, প্রতারকদের দিকে তাকাতাম এবং তাদের মধ্যেও বাসুদেবকে দেখতাম। তমসায় আচ্ছন্ন এই-সব আত্মায়, অপব্যবহৃত এই-সব দেহে আমি নারায়ণকে দেখতাম।"

আলীপুর জেলে অন্য আরো দুটি উপলব্ধি সম্পর্কে এই সময়ে তিনি এগিয়ে যেতে থাকেন। তা হল— সক্রিয় এবং নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মের ভাবসহ পূর্ণ ব্রহ্মের উপলব্ধি এবং সেই অতিরিন্দ্রিয়ের উপলব্ধির পথে জ্ঞানের উচ্চতর স্তরের উপলব্ধি। জেলে তাঁর কতকগুলি অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয় যা তিনি মধ্যে মধ্যে বর্ণনা করেছেন। এই-সব অভিজ্ঞতার একটা হ'ল ক্রোধ সম্পর্কে এবং সে সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন :

"একবার আমি দেখলাম ক্রোধ এসে আমাকে অধিকার করছে। অমি আমার নিজের প্রকৃতির পরিচয় পেয়ে আশ্চর্যান্বিত হলাম। আমি কখনো আর ক্রোধের বশবর্তী হতাম না।"

"আর একবার আমি যখন (১৯০৮) আলীপুর জেলে বিচারাধীন বন্দী ছিলাম, তখন আমার ক্রোধ একটা ভয়ানক দুর্ঘটনা ঘটাচ্ছিল তবে সৌভাগ্যবশত সেটা প্রতিরোধ করা হয়। সেখানে বন্দীদের সেলে ঢোকবার আগে খানিকক্ষণ বাইরে অপেক্ষা করতে হ'ত। আমরা একদিন যখন এই রকম বাইরে দাঁড়িয়ে আছি তখন জেলের স্কচ্ ওয়ার্ডার এসে আমাকে একটা ধাক্কা দেয়। আমার চার দিকে অন্যান্য যে যুবকরা দাঁড়িয়েছিল তারা ভীষণ উত্তেজিত হয়ে ওঠে। আমি কিছু না করে তার দিকে শুধু একবার তাকাই এবং সে তৎক্ষণাৎ পালিয়ে গিয়ে জেইলারকে ডেকে আনে। এটা ছিল সংক্রামক ক্রোধ এবং সবাই তাকে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। জেইলার ছিলেন খানিকটা ধর্মভীরু। তিনি যখন এলেন, ওয়ার্ডার তাকে বলল যে আমি নাকি তার

দিকে দুর্বিনীত দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছি। জেইলার আমাকে জিজ্ঞেস করলে আমি বলি যে আমি কোনো সময়েই এই ব্যবহারে অভ্যস্ত নই। জেইলার সকলকে শান্ত ক'রে যাওয়ার সময় বলে গেলেন "আমাদের প্রত্যেককেই নিজেদের ক্রুশ বহন করতে হবে।"

শ্রীঅরবিন্দ, শিল্পকলার গুণগ্রহণ সম্পর্কে তাঁর আর-একটি অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন :

"আমি ভাস্কর্য কিছুটা জানতাম কিন্তু চিত্রাঙ্কণ কিছুই জানতাম না। আলীপুর জেলে ধ্যানস্থ থাকার সময় একদিন হঠাৎ দেওয়ালে কয়েকটা ছবি দেখতে পেলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার শিল্পরসিক দৃষ্টি খুলে গেল এবং চিত্রাঙ্কণের বাস্তব দিকগুলি ছাড়া, চিত্রাদির গুণাগুণ সম্পর্কে সমস্ত কিছু জ্ঞাত হলাম। উপযুক্ত পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান না থাকায়, আমি সব সময়ে সঠিকভাবে প্রকাশ করতে পারতাম না তবে গুণ গ্রহণের পক্ষে তা বাধা হত না। সুতরাং যোগে সব-কিছুই সম্ভব।

আলীপুর জেলেই বায়ু থেকে লঘুতর হওয়ার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তিনি বলেছেন :

"আমি তখন প্রাণস্তরে এক কঠোর সাধনায় রত এবং সম্পূর্ণ একাগ্র। আমার মনে একটা প্রশ্ন : "উত্থাপনার মতো সিদ্ধি কি সম্ভব।" হঠাৎ আমি দেখলাম আমি এমনভাবে ওপরে উঠে গেছি যা আমার শারীরিক শক্তি দিয়ে সম্ভবপর ছিল না। দেহের একটা অংশ শুধু মাটির সঙ্গে একটু ছুঁয়ে

ছিল বাকিটা দেওয়ালের গা দিয়ে ওপরে উঠে গেছে। আমি ইচ্ছে করলেও ঐ রকমভাবে আমার দেহকে রাখতে পারতাম না ; তা ছাড়া আরো বুঝতে পারলাম, দেহের যে অংশ ঝুলে আছে তার জন্য অন্য অংশের কোনো কষ্ট হচ্ছে না।"

আলীপুর জেলে অন্য একটি আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা হ'ল বিবেকানন্দ সম্পর্কে :

"জেলের নির্জন সেলে ধ্যানের সময় দুই সপ্তাহ ধরে বিবেকানন্দের কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছিলাম এবং তার উপস্থিতি অনুভব করছিলাম। এই কণ্ঠস্বর, আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র সম্পর্কে সীমিত কিন্তু বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে বলতে থাকে এবং ঐ বিষয়ে তার বলার কথা শেষ করে চুপ হয়ে যায়।"

বিকর্ষণ সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা হল :

"আমি নিজে যখন ছোটো ছিলাম এবং নিষ্ঠুর কোনো কিছু পড়তাম তখন একটা বিকর্ষণ অনুভব করতাম এবং যারা নিষ্ঠুর আচরণ করে তাদের ঘৃণা করতাম। আমি একটা পোকা, একটা ছারপোকা বা মশা মারতে পারতাম না। আমি যে অহিংসায় খুব বিশ্বাসী ছিলাম বলে তা পারতাম না তা নয়, আমার দয়া হ'ত এবং দেহেও একটা বিকর্ষণ অনুভব করতাম। পরে, আমার মনের দিক থেকে কোনো আপত্তি না থাকলেও দেহ কোনো ক্ষতি করতে রাজি হত না বলে কারো ক্ষতি করতে পারতাম না।"

"আমি যখন জেলে ছিলাম, তখন প্রথম পনেরো দিন আমার মনের ওপর সব রকম অত্যাচার চালানো হয়। তখন আমার সামনে নানা ধরনের দুঃখদুর্দশার দৃশ্য দেখতাম, তারপর সেই জিনিসটা চলে যায়।

শ্রীঅরবিন্দের চুলে এমন একটা অস্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য ছিল যে, তাঁর জেলের সহবাসীরা মনে করতেন তিনি চুলের তেল ব্যবহার করেন এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন যে তা সত্যি নয়। একমাত্র সাধনার জন্যই তাঁর চুলে এই উজ্জ্বলতা আসে।

এই সময়ে জীবন সম্পর্কে তাঁর ধারণা একেবারে পালটে যায়। আধ্যাত্মিক শক্তি ও উৎসাহ এবং জীবনের কাজে ঐশী নির্দেশ অর্জন করার উদ্দেশ্যে তিনি যোগ-সাধনা আরম্ভ করেন। কিন্তু তাঁর অন্তরতর আধ্যাত্মিক জীবন ও উপলব্ধি পরিমাণে ও সর্বব্যাপকতায় ক্রমশ এত বাড়তে লাগল এবং তাকে এমনভাবে অভিভূত করে তুলতে লাগল যে তাঁর কাজ এরই ফল এবং অংশ হয়ে দাঁড়ায়। দেশের সেবা এবং মুক্তির চাইতে অনেক বড়ো হয়ে উঠল। প্রথমে যা একটা সামান্য ধারণা ছিল তা বিশ্বব্যাপী সমগ্র মানব-জাতির ভবিষ্যতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়ল।

শ্রীঅরবিন্দের ক্ষেত্রে "যোগই সমগ্র জীবন" এটাই লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল।

জেলে তিনি যে আদেশ পান তা তিনি শুধু তাঁর বক্তৃতায় বলেন নি, ইংরেজীতে 'কর্মযোগী' এবং বাংলায় 'ধর্ম' নামক যে দুটি সাপ্তাহিক পত্রিকা তিনি প্রকাশ করতেন তাতেও

বিধৃত করতেন। এই সাপ্তাহিক তুটি জনপ্রিয় ছিল এবং প্রচারও মন্দ ছিল না।

শ্রীঅরবিন্দ 'কর্মযোগী'তে লেখেন যে "আমরা এখন নিজেদের যে কর্তব্যে নিযুক্ত করলাম তা বস্তুজগতের নয় তা হল নৈতিক ও আধ্যাত্মিক। এখন আমাদের লক্ষ্য সরকারের পরিবর্তন নয়, জাতিগঠন। সেই কাজে রাজনীতি একটা অংশ কিন্তু একমাত্র অংশ নয়। আমরা কেবল রাজনীতিতে আত্মনিয়োগ করব না, কেবলমাত্র সামাজিক সমস্যা, ধর্মতত্ত্ব বা সাহিত্য বা বিজ্ঞানে আত্মনিয়োগ করব না। আমরা এর সবগুলির একীভূত রূপ ধর্মকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করি। ভারত একটা মহান জীবন-ধারণ-পদ্ধতি, মানুষের ক্রমবিকাশের একটা মহান নীতি উদ্ভাবিত করবে, আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব করবে এবং সেই রকম-ভাবেই সে নির্দেশিত। এইটেই হ'ল সনাতন ধর্ম। জীবনের উৎস এবং আমাদের নিজেদের মধ্যে শক্তির উৎস খুঁজে বের করতে হবে। আমাদের অতীত জানতে হবে এবং আমাদের গড়ে তোলার জন্য তা পুনরুদ্ধার করতে হবে। আমাদের কাজ হ'ল প্রথমে নিজেদের চিনতে হবে তার পর সব-কিছু ভারতের চিরন্তন জীবন এবং প্রকৃতির ছাঁচে ঢেলে নিজেদের গড়ে তুলতে হবে। আমরা বিশ্বাস করি যে যোগই হ'ল মানবজীবনের আদর্শ; যোগবলেই সে স্বাধীনতা লাভের শক্তি অর্জন করবে; যোগবলেই সে একতা ও মহত্ত্ব অর্জন করবে; যোগবলেই স্বাধীনতা রক্ষা করার শক্তি লাভ করবে। আমরা আধ্যাত্মিক বিপ্লবের কথাই ভাবছি এবং বাস্তবে তার শুধু ছায়া বা প্রতিবিম্ব দেখা যায়।"

আবারও বলেছেন : যে-সব সমস্যা মানবজাতি ভোগ করছে, অন্তরের সাম্রাজ্যকে জয় করেই শুধু তার সমাধান করা যেতে পারে ..."

'কর্মযোগী'র বিভিন্ন সংখ্যায় শ্রীঅরবিন্দের বাজি প্রভু, এপিফ্যানি ও অন্যান্য কবিতা ; জাতীয় শিক্ষার একটি পদ্ধতি, ভারতের মস্তিষ্ক, শিল্পকলার জাতীয় মূল্য, কর্মযোগীর আদর্শ, এবং ঈশ, কেন ও কঠ উপনিষদের ইংরেজী অনুবাদ, কালিদাসের ঋতুসংহার এবং বঙ্কিমের আনন্দমঠের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। কর্মযোগীতে নানা বিষয় সম্পর্কে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়।

আদেশ

শ্রীঅরবিন্দ ইংরেজ জাতির মনোভাব, চরিত্র ও তাদের রাজনৈতিক স্বাভাবিক প্রেরণা পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, ভারতীয় জনসাধারণের স্বাধীনতার প্রচেষ্টায় যদিও তারা প্রতিরোধ করবে এবং রাজকীয় নিয়ন্ত্রণ দুর্বল না হয় সেইরকম ভাবে অতি সাবধানে কিছু কিছু সংস্কারে রাজি হবে, তবে তারা শেষ পর্যন্ত অতি নিষ্ঠুর হবে না। তারা যদি দেখতে পায় যে প্রতিরোধ এবং বিদ্রোহ ক্রমাগত ছড়িয়ে পড়ছে— তা হলে তারা শেষ পর্যন্ত তাদের সাম্রাজ্যের যতটুকু পারা যায় বাঁচাবার জন্য একটা আপস মীমাংসায় আসবার চেষ্টা করবে অথবা চরম অবস্থায় জোর করে তাদের হাত থেকে স্বাধীনতা আদায় করার পরিবর্তে স্বাধীনতা দান করাই বাঞ্ছনীয় মনে করবে। তিনি যা ভেবেছিলেন পরবর্তী ঘটনা ঠিক তাই হয়।

১৯০৫ খৃস্টাব্দে লর্ড কার্জনের পরিবর্তে লর্ড মিণ্টো ভারতের গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন। লর্ড মিণ্টো ছিলেন রক্ষণশীল। ইংল্যাণ্ডে স্বরাষ্ট্রসচিব জন মর্লে ছিলেন উদারনৈতিক। মর্লে, লর্ড মিণ্টোকে একখানা চিঠি লেখেন যাতে ইংরেজ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বোঝা যায়। এতে ছিল : "কিন্তু আমরা, ভারত সরকার, বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে চোখ বুজে থাকতে পারি না। রাজনৈতিক আবহাওয়ায় বহু পরিবর্তন আসছে। আমাদের সামনে বহু প্রশ্ন রয়েছে যেগুলি আমরা অবজ্ঞা করতে পারি না। যেগুলির উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করতেই হবে। আমার মনে হয় আমাদের দিক থেকেই সাড়া আসা

উচিত। সেইটেই সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ; এই দেশের আন্দোলন অথবা স্বদেশের চাপে ভারত সরকারকে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়। সেই অবস্থায় আমাদেরই প্রথম পরিস্থিতি স্বীকার করে, ভারতের প্রাত্যহিক জীবনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নিয়ে বৃটিশ সরকারের কাছে আমাদের মতামত পেশ করা উচিত।"

বাংলার লেঃ গভর্নর, লর্ড মিণ্টোর কাছে যে-সব চিঠি লেখেন তাতে শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কে সরকারের মনোভাবের প্রতিফলন পাওয়া যায়:

"বাংলার অথবা ভারতের যে-কোনো ব্যক্তির তুলনায় শ্রীঅরবিন্দকে আমি, বিদ্রোহাত্মক বাণী প্রচারে বেশি উৎসাহী বলে মনে করি।" লর্ড মিণ্টোও নিশ্চয়ই ঐ মত পোষণ করতেন। কারণ তিনি জন মর্লেকে লেখেন যে, "আমি শুধু এ কথা আবার বলতে পারি, আমাদের যাদের নিয়ে কাজ করতে হচ্ছে, তাদের মধ্যে ইনিই হলেন সব চাইতে বিপজ্জনক···।"

শ্রীঅরবিন্দ বরিশালে প্রাদেশিক সম্মেলনে যোগ দিয়ে বক্তৃতা দেন। এদিকে সরকার তাঁর হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বদ্ধপরিকর। তাঁকে দ্বীপান্তরে পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যা, ভগিনী নিবেদিতাও একজন বিপ্লবী ছিলেন। শ্রীঅরবিন্দের কাজকর্ম সম্পর্কে খোঁজ রাখতেন। তিনি এই পরিকল্পনার কথা শুনতে পান। ১৯০২ খৃস্টাব্দে বরোদায় তাঁদের প্রথম দেখা হয়। এই সাক্ষাতের পূর্বে তিনি তাঁকে কালী-উপাসক বা বিপ্লবী বলে

জানতেন। পরে ১৯০৩ খৃস্টাব্দে, বাংলায় কাজ করার জন্য তিনি যখন পাঁচজন সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেন, ভগিনী নিবেদিতা তখন কমিটির অন্যতমা সদস্যা হন। তিনি তাঁকে বৃটিশ ভারত পরিত্যাগ ক'রে অন্য কোথাও গিয়ে বাইরে থেকে কাজ করার পরামর্শ দেন, কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ অন্য সমাধানের কথা ভাবছিলেন। ১৯০৯ খৃস্টাব্দের ২৫ ডিসেম্বর কর্মযোগীতে তাঁর দেশবাসীর কাছে একটি প্রকাশ্য পত্র মুদ্রিত করেন তাতে তিনি তাঁর দ্বীপান্তরের সম্ভাবনার কথা জানান এবং দেশের জন্য যাকে বলা যায়, তাঁর শেষ উইল ও ইচ্ছাপত্র প্রকাশ করেন। তিনি নিশ্চিতরূপে জানতেন যে এতে দ্বীপান্তরের সরকারী বাসনা নষ্ট হয়ে যাবে এবং তাঁর ধারণা সঠিক ছিল।

তা হলেও সরকারী পরিকল্পনা এত সহজে বানচাল করা সম্ভবপর ছিল না। শ্রীঅরবিন্দ খবর পেলেন যে তাঁর কর্মযোগীর অফিসখানা তল্লাসী করে সরকার তাঁকে গ্রেফতার করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। তিনি তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে কর্মযোগীর অফিসেই ছিলেন। পরবর্তী কর্মপন্থা নিয়ে তাঁরা আলোচনা করেন। রামচন্দ্র মজুমদার লড়াই করার জন্য তৈরি ছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর পরবর্তী কর্মপন্থা সম্পর্কে চিন্তা করছিলেন। তার পর তিনি নিজেই বলেছেন "আমি শূন্য থেকে একটা কণ্ঠস্বর শুনলাম সেটি বলছে, 'না, চন্দননগরে যাও।' জেল থেকে বেরোবার পর আমি এইরকম প্রত্যাদেশ পেতাম এবং সেই সময়ে সেগুলি নির্বিচারে মেনে নিতাম।"

তিনি সময়ের একটুও অপব্যয় করলেন না। দশ মিনিটের মধ্যে তিনি গঙ্গাতীরে গিয়ে চন্দননগরে যাওয়ার

উদ্দেশ্যে একটি নৌকায় উঠে বসলেন। তখন চন্দননগর ছিল ভারতে ফরাসী শাসিত একটি অঞ্চল। ১৯১০ খৃস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি চন্দননগরে আত্মগোপন করেন। ধরা পড়ার ভয়ে তিনি মধ্যে মধ্যে বাড়ি বদলাতেন। চন্দননগরের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি মতিলাল রায়ই প্রধানত তাঁর সব ব্যবস্থা করে দিতেন। শ্রীঅরবিন্দ, ভগিনী নিবেদিতাকে খবর পাঠালেন যে তিনি যেন তাঁর অনুপস্থিতিতে 'কর্মযোগী'র সম্পাদকীয় ভার নেন।

এত অসুবিধে সত্ত্বেও শ্রীঅরবিন্দর সাধনা পূর্ণমাত্রায় চলতে থাকল। ধ্যানের সময় তিনি তিন-চারটি দেবীমূর্তি দেখতে পেতেন। পরে পণ্ডিচেরীতে তিনি যখন বেদপাঠ শুরু করেন তখন তিনি তাঁদের বৈদিক দেবী ইলা, ভারতী, মহী ও সরস্বতী বলে চিনতে পারেন।

এর পরে কী করা যায় শ্রীঅরবিন্দ সেই কথাই ভাব-ছিলেন। কয়েকজন বন্ধু পরামর্শ দেন যে তাঁর ফ্রান্সে চলে যাওয়া উচিত। আবার আদেশ এল পণ্ডিচেরী যাওয়ার জন্য।

শ্রীঅরবিন্দ ১৯১০ খৃস্টাব্দে ৩১ মার্চ কলকাতায় ফিরে আসেন। উত্তরপাড়ার কয়েকজন বিপ্লবী নৌকো বেয়ে নিয়ে আসেন। সেখানে তিনি জ্যোতীন্দ্রনাথ মিত্র এই ছদ্মনাম নিয়ে ডুপ্লে জাহাজে ওঠেন। ১৯১০ খৃস্টাব্দে ১লা এপ্রিল ভোরবেলা জাহাজটি পণ্ডিচেরীর উদ্দেশে রওনা হয়।

পণ্ডিচেরীতে

ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত পণ্ডিচেরীর একটা সুপ্রাচীন ঐতিহ্য আছে। প্রাচীন শাস্ত্রে বলে যে ঋষি অগস্ত্য, উত্তর থেকে এসে পণ্ডিচেরীতে বসবাস করেন; তখন একে দেবপুরী বলা হত। একজন ফরাসী পুরাতত্ত্ববিদ জোভু দেব্রেউইল ঐ কথা সমর্থন করেন।

১৯১০ খৃস্টাব্দের ৪ এপ্রিল বিকেল চারটের সময় শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিচেরীতে পৌছান। ৪ সংখ্যাটির জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী তাৎপর্য হল "প্রকৃতিতে অতিমানসের উপলব্ধি।"

এই সময় থেকে শ্রীঅরবিন্দের যোগসাধনা কঠোর থেকে কঠোরতর হতে লাগল। তাঁর পক্ষে রাজনৈতিক কর্ম-প্রচেষ্টায় অংশগ্রহণ আর সম্ভব ছিল না। পুনরুজ্জীবিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করার জন্য একাধিকবার অনুরোধ এলেও তা প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি যে বিপ্লবীদলের নেতৃত্ব করতেন, দুই-একজনের মাধ্যমে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন বটে কিন্তু কিছুদিন পরে তাও ছিন্ন হয়ে যায়। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁর ধারণা যত স্পষ্ট হতে লাগল ততই তিনি বুঝতে পারছিলেন যে ভারতের স্বাধীনতা লাভ সুনিশ্চিত। আধ্যাত্মিক কাজই যে প্রধান হয়ে দাঁড়াবে এবং তাঁর সমগ্র শক্তি তাতেই নিয়োজিত করতে হবে এটা তিনি ক্রমশ পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারছিলেন।

আলীপুর জেলে বিবেকানন্দের আত্মা তার আভাস দিয়েছিলেন, পরে শ্রীঅরবিন্দ তার আখ্যা দিয়েছেন "অতি মানস"।

সব-কিছুর মধ্যে এই সত্যজ্ঞান কী করে কাজ করছে ঐ আভাস থেকে তিনি তা বুঝতে পারেন। মানবজাতির কল্যাণের উদ্দেশ্যে পৃথিবীকে পুনর্গঠন করবার জন্য এর নেমে আসা অতি প্রয়োজনীয়। মানবজাতি যে দুর্দশার মধ্যে আছে তা থেকে তাদের উদ্ধারে প্রকৃতপক্ষে এটাই একমাত্র উপায়। পরে তিনি বারীনকে বুঝিয়ে বলেন: "কেউ যদি অতিমানসের স্তরে উঠতে না পারে তা হলে বিশ্বের শেষ কথাটা জানা খুব শক্ত। বিশ্বের সমস্যাগুলির সমাধান হয় না।"

শ্রীঅরবিন্দ বলতেন যে, প্রকৃতিতে উচ্চতর স্তরের দিকে একটা ক্রমবিকাশ ঘটছে; যেমন পাথর থেকে বৃক্ষলতা, বৃক্ষলতা থেকে জীব, জীব থেকে মানুষ। বর্তমানে মানুষ এই ক্রমবিকাশের শীর্ষে পৌঁছে গেছে এবং সে বিশ্বাস করে পৃথিবীতে তার চাইতে উন্নততর কিছু হতে পারে না। এইখানেই সে ভুল করে। প্রকৃতির দিক দিয়ে সে এখনো পশু, চিন্তা করতে ও কথা বলতে সক্ষম পশু, বাস্তব অভ্যাস এবং স্বাভাবিক প্রকৃতির দিক থেকে পশু। প্রকৃতি স্বাভাবিক-ভাবেই এই রকম অসম্পূর্ণতায় সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। প্রকৃতি এমন জীব সৃষ্টি করতে চেষ্টা করছে যে হবে বর্তমান মানুষের চাইতেও উচ্চতর জীব। মানুষকে এই সত্য শিক্ষা দেওয়ার জন্যই শ্রীঅরবিন্দ পৃথিবীতে আসেন। তিনি বলে গেছেন যে মানুষ মানসিক জ্ঞানের একটা অস্থায়ী পর্যায়ে রয়েছে তবে এর নতুন জ্ঞান অর্থাৎ সত্যজ্ঞান অর্জন করার সম্ভাবনা আছে এবং সম্পূর্ণ সংগতিপূর্ণ, সুখী, সুন্দর ও পূর্ণ সজ্ঞান জীবনযাপন করার সামর্থ্য আছে। তিনি যাকে "অতিমানস" বলেছেন সেই জ্ঞানে স্থিতধী হতে এবং যাঁরা এই

জ্ঞানলাভ করতে ইচ্ছুক ছিলেন তাঁদের সাহায্য করতে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর সমস্ত সময় ব্যয় করতেন।

তাঁর যোগের লক্ষ্য ছিল অন্তরাত্মার উন্নতি। যাঁরা এই যোগ সাধনা করবেন তাঁরা এর ফলে এক সময়ে সমস্ত কিছুর মধ্যে নিজেকে আবিষ্কার করতে পারবেন এবং একটা উচ্চতর আধ্যাত্মিক ও অতিমানসিক জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন যা মানবপ্রকৃতিকে ঐশীভাবাপন্ন করবে।

বেশির ভাগ লোকই মনে করেন যে এর ফলে তাঁরা উচ্চতর আধ্যাত্মিক জগতে বাস করতে থাকবেন এবং বিশ্ব বা ভারতের কল্যাণ সম্পর্কে উদাসীন হয়ে পড়বেন, কিন্তু তা সত্যি নয়। এইরকম ব্যাপার ঘটতেই পারে না কারণ তাঁর যোগের লক্ষ্য কেবল ভগবানকে উপলব্ধি করা এবং সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করাই ছিল না। এই আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও কর্মপ্রচেষ্টাকে সমগ্র জীবন ও বিশ্বের সমগ্র কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে যুক্ত করে জীবনকে আধ্যাত্মিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করাও তাঁর লক্ষ্য ছিল। যখন শ্রীঅরবিন্দ নির্জনে থাকতেন তখন তিনি বিশ্বে ও ভারতে যা-কিছু ঘটছে তার ওপর লক্ষ্য রাখতেন। যখনই প্রয়োজন মনে করতেন তখনই সম্পূর্ণভাবে আধ্যাত্মিক শক্তি দিয়ে এবং নীরব আধ্যাত্মিক কর্মপন্থা দিয়ে অমঙ্গল প্রতিরোধ করতেন।

পণ্ডিচেরীতে উপস্থিত হওয়ার দিন থেকে ১৯১০ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত শ্রীঅরবিন্দ, কোমতি চেট্টি স্ট্রীটে শঙ্কর চেট্টির বাড়িতে অতিথি ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ যখন এখানে আসেন তিনিও তখন ঐ বাড়িতেই। পরে শ্রীঅরবিন্দ রুয়ে সাফ্রেনে সুন্দর চেট্টির বাড়িতে চলে যান।

কয়েক বছর পূর্বেই একজন দক্ষিণ-ভারতীয় যোগী নাগাই জাপাটা শ্রীঅরবিন্দের আসার পূর্বাভাস দেন। শীঘ্রই দেহত্যাগ করবেন এটা জানতে পেরে এই যোগী তাঁর শিষ্যদের তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেন। কাডাইলামের তখনকার জমিদার কে. ডি. আর. আয়েঙ্গার তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, "ভবিষ্যতে আমি কার কাছ থেকে নির্দেশ নেব?" গুরু উত্তরে বলেন যে, "উত্তর ভারত থেকে একজন যোগী আসবেন তাঁর কাছ থেকে।" তিনি আরো বলেন যে এই মহান যোগী দক্ষিণভারতে আশ্রয় গ্রহণ করবেন এবং আসার পূর্বে তিনটি জিনিস ঘোষণা করবেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর জীবনের তিনটি আশার কথা তাঁর স্ত্রী মৃণালিনী দেবীকে বলেছিলেন, বলতেন এগুলি ওঁর পাগলামি। কে. ডি. আর. আয়েঙ্গার বুঝতে পারলেন নাগাই জাপাটা শ্রীঅরবিন্দের কথাই বলেছেন এবং তিনি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন।

কে. ডি. আর. আয়েঙ্গারের সঙ্গে (পরবর্তীকালে তামিল সাহিত্য জগতে "ভা-রা" বলে পরিচিত), রামস্বামী আয়েঙ্গারও আসেন। শ্রীঅরবিন্দ একবার ধ্যানের সময় এঁকে দাড়িসমন্বিত সাধক হিসেবে দেখেন। তিনি প্রথমে যখন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন তখন তিনি গুম্ফশ্মশ্রুহীন বৈষ্ণব ছিলেন কিন্তু এক বছর পণ্ডিচেরীতে থাকার পর দাড়িসমন্বিত সাধক হয়ে যান।

কে. ডি. আর. আয়েঙ্গার শ্রীঅরবিন্দকে আর্থিক সাহায্যও করেন এবং "যৌগিক সাধনা" পুস্তকটি প্রকাশ করেন। এই বইটি ছিল "স্বয়ংক্রিয় রচনা" পরীক্ষার ফল। এই পুস্তকটি রচনার সময় একটি মূর্তি দেখতে পাওয়া যায় যার সঙ্গে রাজা

রামমোহন রায়ের সাদৃশ্য ছিল। বরোদায় থাকার সময় বারীন কিছু অত্যাশ্চর্য স্বয়ংক্রিয় রচনা নিয়ে পরীক্ষা করেন। এর পেছনে কী আছে তা জানার জন্য শ্রীঅরবিন্দ এই ধরনের রচনাপদ্ধতি অভ্যাস করেন। কিন্তু এর ফল দেখে তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। পণ্ডিচেরীতে আরো কয়েকবার চেষ্টা করার পর তিনি এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা পরিত্যাগ করেন।

শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরীতে উপস্থিতির পূর্বেই সুব্রহ্মণ্যম ভারতী, শ্রীনিবাসচারী, নায়াস্বামী আইয়ার, ভি. রামস্বামী আয়েঙ্গার, ভি. ভি. আইয়ার এবং আরো কয়েকজন বিপ্লবী এই শহরে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে কয়েকজন ভারতের স্বাধীনতাকামী 'ইণ্ডিয়া' বলে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করছিলেন।

ভারতের বৃটিশ সরকার শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কে ভীত ছিলেন। তাঁর ওপর লক্ষ্য রাখার জন্য এবং সম্ভব হলে তাঁকে হরণ করে বৃটিশ ভারতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বৃটিশ গোয়েন্দা বিভাগের লোক নিযুক্ত করা হয়েছিল। পণ্ডিচেরীর একজন ধনী স্টিভেডোর নন্দগোপাল চেট্টি, এই দুষ্ট পরিকল্পনা সফল করে তোলায় সাহায্য করতে রাজী হয়েছিলেন বলে মনে হয়। তবে তিনি তাতে সফল হতে পারেন নি। যেদিন তাঁর শ্রীঅরবিন্দকে অপহরণ করার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করার কথা সেইদিনই তাঁর নামে একটি গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয় এবং তিনি নিজেই মাদ্রাজে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন।

এইরমকভাবে বাধা পেয়ে, শ্রীঅরবিন্দকে জড়ানোর উদ্দেশ্যে বৃটিশ গোয়েন্দা বিভাগ আর-একটি পরিকল্পনা তৈরি করে। তারা কতকগুলি বিদ্রোহাত্মক রচনা— সেগুলির মধ্যে

বাংলা বইও ছিল— শ্রীঅরবিন্দের অন্যতম বন্ধু ভি. ভি. এস. আইয়ারের বাড়ির একটি কুয়োয়, টিনে ভরে লুকিয়ে রাখে। সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশ গোয়েন্দাগণ, মায়া সেন নামক একজন ব্যক্তিকে বলে যে সে যেন পুলিশকে খবর দেয় যে আইয়ার এবং অন্যান্যরা বিপজ্জনক কাজকর্মে লিপ্ত আছে এবং তাদের বাড়ি খানাতল্লাস করলেই এর প্রমাণ পাওয়া যাবে। সৌভাগ্যক্রমে আইয়ারের একজন ভৃত্য কুয়োর মধ্যে সেই টিনটি দেখতে পায় এবং শ্রীঅরবিন্দের পরামর্শ অনুযায়ী পুলিশকে তা জানায়। ফরাসী পুলিশ এসে টিনটি উদ্ধার করে এবং সেই-সব বই পায়! শ্রীঅরবিন্দের বাড়িতেও খানাতল্লাসী করা হল। তদন্তকারী ফরাসী ম্যাজিস্ট্রেট মঁসিয়ে নঁাদাত, তদন্ত করার সময় যখন দেখতে পেলেন যে শ্রীঅরবিন্দ গ্রীকসহ কয়েকটি ইউরোপীয় ভাষা জানেন, তখন তিনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন। এতে শ্রীঅরবিন্দের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা বেড়ে গেল এবং তাঁকে তিনি তাঁর চেম্বারে যাওয়ার জন্য অনুরোধ জানালেন।

গোপনে সংবাদপ্রদানকারী যখন দেখল যে তার উদ্দেশ্য বানচাল হয়ে গেল তখন ভুল খবর দেওয়ার অপরাধে পাছে শাস্তি পেতে হয়, সেই ভয়ে সে বৃটিশ ভারতে পালিয়ে গেল।

তাঁর পেছনে গোয়েন্দাগিরি চলতে থাকল। শ্রীঅরবিন্দের আশীর্বাদ তার যক্ষ্মারোগ নিরাময় করতে পারে কিনা তা দেখার জন্য খুলনার জনৈক নগেন নাগ তাঁর কাছে পণ্ডিচেরীতে এসেছিল। এতে গোয়েন্দারা শ্রীঅরবিন্দের বাড়িতে ঢোকবার একটা সুযোগ পেল। গোয়েন্দা বিভাগ তাদের একজন এজেণ্টকে (বীরেন্দ্রনাথ রায়) নগেন নাগের পাচক হিসাবে নিযুক্তির

ব্যবস্থা করল। কয়েক মাস পর এই পাচকটি বাংলাদেশে ফিরে যেতে চাইল এবং পুলিশকে অন্য কোনো লোকের ব্যবস্থা করতে বলল। পুলিশ ব্যবস্থা করল যে বীরেন্দ্র তার মাথা ন্যাড়া করে ফেলবে এবং নতুন লোক স্থানীয় একটা হোটেলে, তার ন্যাড়া মাথা দেখে তার সঙ্গে আলাপ করবে। অন্য লোকটির আসবার দিন যখন কাছাকাছি হয়ে এসেছে তখন বীরেন্দ্র তার মাথা ন্যাড়া করে ফেলল। এদিকে মণি (সুরেশ চক্রবর্তী) তখন শ্রীঅরবিন্দের কাছে ছিলেন, কী ভেবে তিনিও ন্যাড়া হবেন বলে স্থির করলেন। বীরেন্দ্র এতে ভয় পেয়ে গেল এবং মণি যাতে ন্যাড়া না হয় সেজন্য তাকে অনেক বোঝাতে লাগল। মণি হয়তো তার সত্যিকার পরিচয় জেনে ফেলেছে এই ভেবে বীরেন্দ্র আরো ভয় পেয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত সে স্বীকার করল যে, সে গোয়েন্দা বিভাগের একজন এজেন্ট এবং শ্রীঅরবিন্দের পা ধরে কেঁদে পড়ল এবং বৃটিশ সরকার তাকে যে টাকা দিয়েছিল তা তাঁকে দিয়ে দিতে চাইল।

যে-সব রাজনৈতিক আশ্রয়গ্রহণকারী ফরাসী ভারতে রয়েছেন তাঁদের সমর্পণ করার জন্য বৃটিশ সরকার ১৯১২ খৃস্টাব্দে ফরাসী সরকারের ওপর চাপ দেওয়ায় তাঁরা তাঁদের নিরাপত্তা সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে ফরাসী সরকারের ওপর নির্ভর করতেন বলে স্বভাবতঃই ভয় পেয়ে গেলেন। তাঁদের মধ্যে একজন বিশেষ করে সুব্রহ্মণ্যম ভারতী খুব সহজেই উত্তেজিত হয়ে উঠতেন। তিনি শ্রীঅরবিন্দকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন যে ফরাসী সরকার তাঁদের সাহায্য না করলে তিনি কী করবেন। শ্রীঅরবিন্দ শান্তভাবে উত্তর দিলেন,

"মিঃ ভারতী, আমি পণ্ডিচেরী থেকে এক ইঞ্চিও নড়ছি না ; আমি জানি আমার কিছু হবে না। আপনি কী করবেন তা আপনিই স্থির করুন।" এই ভরসা পেয়ে সুব্রহ্মণ্যমও পণ্ডিচেরীতে থাকবেন বলে স্থির করলেন।

ঐ সময়ে আর্থিক অনটন দেখা দেয়। শ্রীঅরবিন্দ একবার চন্দননগরের মতিলাল রায়ের কাছে লেখেন, "এখনকার যা অবস্থা তা হ'ল, আমাদের কাছে এখন মাত্র আট-দশ আনা আছে, ভগবান যে ব্যবস্থা করবেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই, তবে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করাটা ভগবানের একটা খারাপ অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে।"

কে. অমৃত পরে আশ্রমের ম্যানেজার হন। তিনি স্কুলের ছুটির সময়ে পণ্ডিচেরীতে থাকতেন। তাঁরও আর্থিক সংকট দেখা দেয়। নিজের অসুবিধে সত্ত্বেও শ্রীঅরবিন্দ তাঁকে সাহায্য করতেন। তাঁর ভগ্নী সরোজিনী আর্থিক দুরবস্থায় পড়লে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর 'যুদ্ধ ও আত্মনিয়ন্ত্রণ' পুস্তকটির স্বত্ব তাঁকে দিয়ে দেন।

শ্রীঅরবিন্দ একবার আলীপুর জেলে ১০ দিন উপবাস করেন। এবারে দ্বিতীয়বার তিনি ২৩দিন উপবাস করেন। উপবাসের সময়েও তাঁর কাজকর্ম, ব্যায়াম, ধ্যান ও লেখা সমান গতিতেই চলেছে এবং তিনি একটুও দুর্বলতা বোধ করেন নি। তাঁর ওজন অবশ্য কমে গিয়েছিল কিন্তু তা পূরণ করার কোনো ওজর খুঁজে পান নি। তিনি আস্তে আস্তে তাঁর উপবাস ভঙ্গ করেন নি ; উপবাস ভঙ্গ করেই স্বাভাবিক খাদ্য গ্রহণ করতে থাকেন।

এই সময়ে শ্রীঅরবিন্দের যোগাভ্যাস কি রকম চলছিল?

পরমাত্মাকে বাস্তব জগতে নিয়ে আসা সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দ ইতিমধ্যেই যথেষ্ট ক্ষমতা অর্জন করেন। ১৯১১ খৃস্টাব্দে ১২ জুলাই তিনি একটি চিঠিতে লেখেন, "পরমাত্মাকে বাস্তব জগতে নিয়ে আসার উদ্দেশ্যে আমি প্রয়োজনীয় শক্তি অর্জন করছি। আমি এখন নিজেকে মানুষের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে, তার অন্তরের অন্ধকার দূর করে, আলো এনে. তাকে নতুন মন, অন্তঃকরণ দেওয়ার ক্ষমতা অর্জন করেছি। যারা আমার কাছাকাছি বাস করছে তাদের ক্ষেত্রে এটা আমি খুব দ্রুত ও সম্পূর্ণভাবে করতে পারি, তবে শত শত মাইল দূরে অবস্থিত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও আমি এই বিষয়ে সফল হয়েছি। মানুষের চরিত্র, মন, এমন-কি, তার ভাবনা জানার শক্তিও আমি পেয়েছি তবে এই শক্তি এখনো সম্পূর্ণ নয়, তা ছাড়া এটা আমি সব সময়ে সকলের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারি না। অন্য জগতের সঙ্গে আমার যোগাযোগ এখনো সহজ হয় নি, তবে কয়েকটি বিরাট শক্তির সঙ্গে আমার যোগাযোগ রয়েছে। আমার পথ থেকে বাধাগুলি যখন সম্পূর্ণ দূরীভূত হবে তখন আমি এই-সব জিনিস সম্পর্কে আরো লিখে জানাব।

যিনি তাঁর সত্যিকার সহযোগিণী হবেন সেই মা না আসা পর্যন্ত শ্রীঅরবিন্দের সাধনা ও কাজ অপেক্ষা করছিল। ১৯১৪ খৃস্টাব্দের ২৯ মার্চ তিনি ফ্রান্স থেকে এলেন।

মা

১৯১৪ খৃস্টাব্দে ২৯ মার্চ বিকেল ৩-৩০ মিনিটে বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের মা বলে পরিচিত মীরা রিচার্ড— একজন ফরাসী মহিলা— শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে প্রথমবার সাক্ষাৎ করেন।

পণ্ডিচেরীতে আসার পূর্বে ১৯১০ খৃস্টাব্দে তিনি ডেভিডের তারকার একটি নকশা (যা অংশত শ্রীঅরবিন্দের নিদর্শনের মতো) পাঠিয়েছিলেন এবং শ্রীঅরবিন্দ যখন এর তাৎপর্য বুঝিয়ে দেন তখনই তাঁর দৃঢ় ধারণা হল যে এঁর সঙ্গেই তাঁর কাজ করতে হবে।

তাঁর সাধনায় যিনি তাকে পরিচালিত করছেন, যাঁকে তিনি শ্রীকৃষ্ণ বলতেন, ইনিই যে সেই, তা তিনি ১৯১৪ খৃস্টাব্দে ২৯ মার্চ, তাঁকে প্রথম দেখেই বুঝতে পেরেছিলেন।

শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ সম্পর্কে মা বলেছেন— "আমার মন তখন অত্যন্ত কেন্দ্রীভূত, যে-সব জিনিস ঘটা উচিত কিন্তু যেগুলির বাহ্য প্রকাশ নেই— অতিমানসিক দৃষ্টিতে আমি তখন সেগুলি দেখছিলাম। আমি যে-সব জিনিস দেখেছি তা শ্রীঅরবিন্দকে বললাম এবং এগুলির বাহ্য প্রকাশ ঘটবে কিনা তা তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি শুধু বললেন, 'হ্যাঁ।' তৎক্ষণাৎ আমি দেখলাম যে অতিমানস পৃথিবীকে স্পর্শ করেছে এবং আমি তা উপলব্ধি করছি। যা সত্য তাকে বাস্তবে পরিণত করার শক্তি আমি এই প্রথম দেখলাম।"

পরের দিন ৩০শে মার্চ তিনি তাঁর ডায়ারিতে লিখলেন,

"শত শত মানুষ যদি চরমতম অজ্ঞতার মধ্যে নিমজ্জিত থাকে তাতে কিছু যায় আসে না। গতকাল যে ভগবানকে দেখলাম তিনি পৃথিবীতে আছেন; একদিন যে অন্ধকার আলোতে রূপান্তরিত হবে, একদিন যে ভগবানের রাজত্ব সত্যিই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হবে, আপনার উপস্থিতিই তার যথেষ্ট প্রমাণ।"

১৮৭৮ খৃস্টাব্দে ২১ ফেব্রুয়ারি তিনি প্যারিসে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাতের সময় তাঁর বয়স ছিল ছত্রিশ। তাঁর এক জন্মদিনে তিনি বলেছেন, "জন্মের দিক থেকে আমি ফরাসী, কিন্তু আমার আত্মা ভারতীয় এবং ভারতের জন্যই আমার টান।"

অল্প বয়সেই মা বুঝতে পারতেন যে তাঁর পেছনে থেকে, মানবশক্তির চাইতেও বড়ো একটা শক্তি কাজ করছে এবং সেটা মধ্যে মধ্যে দেহে প্রবেশ করে অস্বাভাবিক পদ্ধতিতে কাজ করছে। তিনি জানতেন যে এই শক্তিটাই হল তাঁর গোপন সত্তা। তাঁর বাড়ির কাছে প্রায় তেরো বছরের একটা ছেলে ছিল। সে সব সময়েই বলত, মেয়েরা কোনো কাজের নয়। ছেলেটা ওঁকে ক্ষেপিয়েই যেত। একদিন তিনি ছেলেটাকে চুপ করতে বললেন, কিন্তু সে শুনল না। তিনি ছেলেটার তুলনায় অনেক ছোটো হলেও হঠাৎ একদিন তাকে ধরে মাটির ওপরে তুলে এক আছাড় দেন। পরবর্তী জীবনে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, সেদিন যে শক্তি তাঁর মধ্যে নেমে এসেছিল, তিনি ছিলেন মহাকালী।

আর-একটি দৃষ্টান্ত: ফণ্টেনব্লুর কাছে একটি বনে তিনি খেলতে যান। তিনি একটা খাড়া পাহাড়ে উঠছিলেন। হঠাৎ

পা পিছলে গড়িয়ে পড়তে থাকেন। তিনি অনুভব করেন কেউ যেন তাঁকে কোলে করে আস্তে আস্তে নামিয়ে আনছিলেন। তিনি নীচে নামলেন, তাঁর সঙ্গিনীরা সকলেই আশ্চর্য হয়ে দেখল তিনি নিরাপদে দুই পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে।

চিত্রাঙ্কণ শেখার জন্য ষোল বছর বয়সে তিনি একটি স্টুডিওতে যোগ দেন। সেটি ছিল প্যারিসের অন্যতম বড়ো স্টুডিও। তিনি ছিলেন সর্বকনিষ্ঠা শিক্ষার্থিনী। অন্যরা খুব তর্কবিতর্ক ও ঝগড়া করত; কিন্তু তিনি কোনো সময়েই তাতে যোগ দিতেন না। তিনি সব সময়েই গম্ভীরভাবে নিজের কাজে ব্যস্ত থাকতেন। তারা ওকে 'স্ফিঙ্কস্' বলত। তর্কবিতর্ক বা ঝগড়া হলে তারা মীমাংসার জন্য এঁর কাছে আসত। তাদের মনের কথা বুঝে মতামত দিতেন বলে তারা খুশি হত না। কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট থাকলেও তিনি অকুতোভয়ে তাঁর মতামত দিতেন। একবার ঐ স্টুডিওর একটি মেয়ে মনিটার, স্টুডিও পরিচালিকার কু-নজরে পড়ে। তিনি তাকে চাকুরি থেকে বরখাস্ত করতে চাইলেন। মেয়েটি এই স্ফিঙ্কসের সাহায্য চাইলেন। মেয়েটি অত্যন্ত গরিব এবং চাকরটি হাতছাড়া হলে ওর আর ছবি আঁকা শেখা হবে না, তাই তাঁর সহানুভূতি জাগল। স্টুডিওর পরিচালিকাকে এবারে একজন দৃঢ়মনোভাবাপন্ন মেয়ের সম্মুখীন হতে হল। প্রথমে তিনি কোনো যুক্তি শুনতে চাইলেন না। বেশ একটু রেগে গিয়ে—তিনি বর্ষীয়সী মহিলাটির হাত এমন জোরে চেপে ধরলেন যে মনে হল তার হাড় গুঁড়ো হয়ে যাবে। একটু পরেই তিনি মেয়েটিকে চাকরিতে রাখতে স্বীকৃত হলেন। মহাকালী আবার তাঁর কাজ করলেন।

স্টুডিওর স্ফিঙ্কস বাড়িতেও খুব গম্ভীর হয়ে থাকেন। মুখে হাসি দেখাই যেত না! বয়স যখন প্রায় কুড়ি বছর, গম্ভীর হয়ে থাকেন দেখে মা একবার খুব বকলেন। তাঁর মুখে সোজা উত্তর শোনা গেল, বিশ্বের সমস্ত দুঃখ তাঁকে সহ্য করতে হবে। মা ভাবলেন মেয়েটা বোধ হয় পাগল হয়ে গেছে। কথা না শোনার জন্য মা আর একবারও ভৎর্সনা করেন। তিনি উত্তর দেন যে তিনি পার্থিব কোনো শক্তির কাছে আনুগত্য স্বীকার করবেন না।

তাঁর দেহ যখন ঘুমতো তখন কয়েকজন আচার্য তাঁকে গুহ্য নির্দেশ দেন, স্থূল জগতে পরে এদের কয়েকজনের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। পরে যখন আত্মিক ও বাহ্যিক উন্নতি হয় এঁদের একজনের সঙ্গে তাঁর মানসিক ও আধ্যাত্মিক যোগাযোগ ঘটে এবং ক্রমেই তা বেড়ে ওঠে। তিনি তখন ভারতীয় দর্শন ও ধর্মের কিছুই জানতেন না, তবুও তাঁকে কৃষ্ণ বলে বিশ্বাস করলেন। তিনি জানতেন যে ভগবানের কাজ করার উদ্দেশ্যে এঁর সঙ্গে একদিন তাঁর দেখা হবে। আঁকার হাত ছিল, তিনি তাঁর একটা ছবিও এঁকে ফেললেন।

একজন পোল আচার্য থিয়ন এবং তাঁর বহু অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন ফরাসী স্ত্রীর কাছে তিনি আলজিয়ার্সের ট্যাঞ্জিয়ারে কয়েক বছর নিগূঢ় রহস্য শেখেন।

মা তাঁর আশ্রমপূর্ব জীবন সম্পর্কে বলেছেন, "এগারো থেকে তেরো বছর বয়সের মধ্যে কতকগুলি মানসিক ও আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা হয়। ভগবানের অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছি; এও তখন বুঝে গেছি মানুষ তাঁর সঙ্গে দেখা

করতে পারে, জ্ঞানে এবং কাজে তাঁর অখণ্ডতা প্রকাশ করতে পারে। পৃথিবীতে তাঁর ঐশী জীবন দেখাতে পারে, তাও আমি উপলব্ধি করি।"

"প্রার্থনা এবং ধ্যান" নামক তাঁর আধ্যাত্মিক ডায়ারিতে, তাঁর সাধনা এবং পৃথিবীতে তাঁর প্রকৃত ভূমিকা সম্পর্কে কয়েকটি অভিজ্ঞতার আভাস রয়েছে। তার মধ্যে একটি হ'ল : "আমার যখন তেরো বছর বয়স, এক বছর ধরে—রোজ রাতে বিছানায় ঘুমতে গেলেই আমার মনে হত আমি যেন আমার দেহ থেকে বেরিয়ে এসেছি এবং সোজাসুজি বাড়ির ওপরে, তারপর শহরের ওপরে আরো উঁচুতে উঠে যাচ্ছি ; আমি দেখতাম আমি আমার চাইতেও বড়ো অতি চমৎকার একটা সোনালি পোশাক পরে আছি। যতই উঁচুতে উঠতাম পোশাকটাও আমার চারিদিকে গোল হয়ে বড়ো হয়ে যেত এবং সমস্ত শহরের ওপর যেন বিপুল একটা ছাদ। দেখতাম চারদিক থেকে স্ত্রী, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ, পীড়িত ও অসুখী ব্যক্তিরা বেরিয়ে এসে সেই বিস্তৃত পোশাকের নীচে এক হয়ে নিজেদের দুঃখ-দুর্দশা, ব্যথার কথা বলে সাহায্য ভিক্ষা করছে। পোশাকটি যেন জীবন্ত হয়ে প্রত্যেকের কাছে আলাদাভাবে নিজেকে বাড়িয়ে দিত। যে মুহূর্তে তারা পোশাকটি স্পর্শ করত অমনি তারা পূর্বের চাইতে অনেক বেশি শান্তি লাভ করত বা নীরোগ হয়ে যার যার স্থানে ফিরে যেত।"

তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। তিনি পণ্ডিচেরীতে এক বছরেরও কম সময় থাকেন। ১৯১৫ খৃস্টাব্দে ২২ ফেব্রুয়ারি তিনি ফ্রান্সে চলে যান। ১৯১৬ খৃস্টাব্দে ফ্রান্স থেকে

জাপানে গিয়ে তারপর আবার ভারতে ফিরে আসার আগে প্রায় চার বছর সেখানে ছিলেন।

১৯১৯ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জাপানে মার সঙ্গে দেখা করেন। কিছুকাল তাঁরা একই হোটেলে ছিলেন। তিনি তাঁকে শান্তিনিকেতনের ভার নিতে বলেন। কিন্তু তিনি জানতেন শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গেই তাঁর ভবিষ্যৎ কাজ। তাই এই ভার নিতে রাজী হন নি।

১৯১৫ খৃস্টাব্দে ২২ ফেব্রুয়ারি মা ফ্রান্সে ফিরে গিয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা সম্পর্কে মধ্যে মধ্যে শ্রীঅরবিন্দের কাছে চিঠি লিখতেন এবং তিনি তার উত্তর দিতেন। ১৯১৬ খৃস্টাব্দে ২৬ জুন একটি চিঠিতে তিনি লেখেন, "সেই অতিমানসের আলোক ও শক্তি নিশ্চিতরূপে অধিকার করার দিকেই এখন শক্তি পরিচালিত। কিন্তু সেই উন্নতির পথে বাধা এসেছে। মন যখন অতিমানসের আলোক ও নির্দেশ লাভ করার জন্য মুক্ত থাকতে চায় তখনই পূর্ব বুদ্ধি ও মানসিক ইচ্ছার পুরানো অভ্যাসগুলি মনকে নানা রকম পরামর্শ দিতে থাকে। কাজেই জ্ঞান এবং ইচ্ছাশক্তি প্রায়ই গোলমেলে ও বিকৃত আকারে মনে প্রবেশ করে।"

১৯১৪ খৃ টাব্দে ১৫ অগাস্ট শ্রীঅরবিন্দ মা'র সহযোগিতায় 'আর্য' নামক একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। পত্রিকাটির দুটি লক্ষ্য ছিল— প্রথম লক্ষ্যটি ছিল অস্তিত্বের উচ্চতম সমস্যাগুলি সম্পর্কে একটা ধারাবাহিক আলোচনা। পাশ্চাত্ত্য ও প্রাচ্যের মানবজাতির পরস্পরবিরোধী ধর্মীয় ঐতিহ্যের মধ্যে একটা সংগতি এনে জ্ঞানের বিপুল সমন্বয় আনা দ্বিতীয় লক্ষ্য। এর পদ্ধতি একদিকে যুক্তিবাদ, অন্য দিকে জটিল

দর্শন মিলিয়ে বাস্তবতাবাদ— অর্থাৎ জ্ঞান ও বিজ্ঞানলব্ধ অভিজ্ঞতার সঙ্গে আত্মজ্ঞানলব্ধ অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণজাত বাস্তবতা। এর উৎসাহে যে-সব সংঘ ও সমিতি স্থাপিত হয়, পত্রিকা তার মুখপাত্র হিসেবে কাজ করবে বলে স্থির হয়।

ঐ সঙ্গে "মহান সমন্বয়ের রিভিউ" নাম দিয়ে 'আর্য' পত্রিকাটির একটি ফরাসী অনুবাদও প্রকাশ করা হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ক্রমশ ব্যাপক আকার ধারণ করতে থাকায়, পণ্ডিচেরী থেকে প্রকাশিত এই পত্রিকাটি কয়েক মাস পর বন্ধ হয়ে যায়।

'আর্য' পত্রিকায় ধারাবাহিভাবে, দি লাইফ ডিভাইন, দি সিন্থেসিস্ অব যোগ, দি হিউম্যান সাইকল্, দি আইডিয়াল অব হিউম্যান ইউনিটি, দি সিক্রেট অব দি বেদ, দি এসেজ অন দি গীতা, দি ফাউণ্ডেশনস্ অব ইণ্ডিয়ান কালচার এবং দি ফিউচার পোয়েট্রি প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া, দি হোয়্যারফোর অব দি ওয়ার্লডস্, অ্যানোটেটেড টেকস্টস্— ঈশা উপনিষদ ইত্যাদি ছোটো প্রবন্ধ এবং দি সোল অব এ প্ল্যাণ্ট, দি কোয়েশ্চেন অব দি মান্থ, দি নিউজ অব দি মান্থ, দি সাউথ ইণ্ডিয়া ব্রোঞ্জেস ইত্যাদি নানা ধরনের প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাঁর রচনাগুলি পড়াশুনা এবং ধ্যানের ফল। একটা বিরাট শক্তি তাঁর ওপর নেমে আসে এবং তা সোজাসুজি কলমের মাধ্যমে 'আর্য' পত্রিকায় পরিবাহিত হয়।

১৯২১ খৃস্টাব্দে প্রথম দিকে আর্য পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। এই পত্রিকাটি থেকে বেশ লাভ ছিল। শ্রীঅরবিন্দ তখন তাঁর জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে বেশি মনোযোগ দিতে থাকায় অতিমানসের ঊর্ধ্বে গমন ও নিম্নে অবতরণের জন্য লেখার ব্যাপারে খুব কম সময় পেতেন।

১৯২০ খৃস্টাব্দে ২৪ এপ্রিল মা পণ্ডিচেরীতে ফিরে আসেন। তার পর থেকে আর কোথাও যান নি। ঐ বছরেই ২৪ নভেম্বর, তিনি যে বাড়িতে থাকতেন সেই বাড়ির ছাদ ঝড়-বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শ্রীঅরবিন্দ আরো জানতে পারলেন, ছাদের এত ক্ষতি হয়েছে যে মার সেই বাড়িতে থাকা নিরাপদ নয়। সুতরাং তিনি তাঁকে ৪১নম্বর রুয়ে ফ্রাঙ্কোয় মার্টিনে তাঁর বাড়িতে থাকার জন্য আহ্বান জানালেন।

১৯২১ খৃস্টাব্দে সমবেত ধ্যান আরম্ভ করা হয়। বিকেল প্রায় চারটের সময় সাধারণত এই রকম ধ্যানের ব্যবস্থা করা হত এবং তার পর বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হত।

১৯২২ খৃষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারি মা সেই বাড়ির সমগ্র পরিচালনাভার নিজের হাতে নিলেন। ১৯২২ খৃস্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে তাঁরা ঐ বাড়ি ছেড়ে ৯নম্বর রুয়ে দ্য লা মেরিনের বাড়িতে চলে আসেন। এখানেই এখন আশ্রমের প্রধান বাড়ি এবং এখানেই রয়েছে শ্রীঅরবিন্দের সমাধি।

অতিমনের অবতরণ

শ্রীঅরবিন্দের সাধনা অবারিত গতিতে চলতে থাকল। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনের সভাপতিত্ব করার একাধিক অনুরোধ তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। ১৯২০ খৃস্টাব্দের অগাস্ট মাসে এই সম্পর্কে ডাঃ মুঞ্জেকে যে চিঠি লেখেন তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য: "আমি পূর্বেই টেলিগ্রামযোগে আপনাকে জানিয়েছি যে আমি নাগপুর কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করতে অক্ষম। আমি আধ্যাত্মিক জগতে আর-এক ধরনের কাজ শুরু করেছি, এটা একটা বৈপ্লবিক ধরনের আধ্যাত্মিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজ। সেই অর্থে আমি এখন ব্যাবহারিক বা গবেষণাগারের পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত। এর জন্য আমার সমগ্র মনোযোগ ও শক্তি প্রয়োজন। একেই আমি আমার অবশিষ্ট জীবনের লক্ষ্য বলে গ্রহণ করেছি।"

যাঁদের উপযুক্ত মনে করতেন তাঁদের তিনি সাধনা করতে উৎসাহ দিতেন। জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তাঁর অন্যতম শিষ্য অম্বুভাই পুরানি, ১৯১৮ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে, শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে দেখা করেন। শ্রীঅরবিন্দ তাঁকে সাধনার কথা জিজ্ঞেস করেন। পুরানি তাঁর সাধন-প্রচেষ্টা বর্ণনা করে বলেন যে "...যতদিন না ভারত স্বাধীনতা লাভ করছে ততদিন মনঃসংযোগ করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ছে।" শ্রীঅরবিন্দ তখন জিজ্ঞেস করেন, "ভারত স্বাধীনতা লাভ করবে এই আশ্বাস যদি দেওয়া হয় তা হলে?" পুরানি সোজাসুজি উত্তর দিলেন, "কে

এই আশ্বাস দিতে পারে ?" শ্রীঅরবিন্দ বললেন, "ধর, আমিই যদি দিই ?" পুরানি সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, "আপনি আশ্বাস দিলে মেনে নেব।" তাঁর দিকে ফিরে শ্রীঅরবিন্দ বলেন, "আমি তোমাকে আশ্বাস দিচ্ছি যে ভারত স্বাধীনতা লাভ করবে।"

তাঁর ব্যক্তিগত প্রশ্নের উত্তর পেয়ে পুরানি সন্তুষ্টচিত্তে গুজরাটে ফিরে গেলেন। ১৯২১ খৃস্টাব্দে পণ্ডিচেরীতে ফিরে এসে দেখেন যে শ্রীঅরবিন্দের দেহ থেকে পীতাভ শ্বেত আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। শ্রীঅরবিন্দ বুঝিয়ে দেন যে উচ্চতর জ্ঞান যখন মনের স্তর থেকে প্রাণস্তরে অবতরণ করে এবং প্রাণস্তর থেকেও নিম্নে অবতরণ করে তখন দেহ ও স্নায়ুমণ্ডলে একটা বিপুল পরিবর্তন ঘটে। কয়েকদিন পর পুরানি তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, "আপনি তাহলে কিসের জন্য অপেক্ষা করছেন ?" শ্রীঅরবিন্দ তাঁর স্বাভাবিক স্নিগ্ধ স্বরে উত্তর করলেন, "ঐশী জ্ঞান এসেছে এটা সত্যি কিন্তু সেটা এখনো দেহের অভ্যন্তরে আসে নি। যতদিন পর্যন্ত না সেই কাজ সম্পূর্ণ হচ্ছে ততদিন কর্তব্য সম্পন্ন হয়েছে বলে বলা যায়.না।"

১৯২১ খৃস্টাব্দের শীতকালের মাঝামাঝি সময়ে বিখ্যাত পাথর ছোঁড়ার ঘটনা ঘটে। ভাট্রাল নামক একজন পাচককে বরখাস্ত করা হয়। সে রেগে গিয়ে একজন মুসলমানের কাছে যায়। সে খুব ভালো জাদুবিদ্যা জানত। এই ফকির আশ্রমের একটি বাড়িতে পাথর ছুঁড়তে থাকে। পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। কিন্তু কোনো কারণ ছাড়াই একটা পাথর একজন পুলিশের পায়ের ফাঁক দিয়ে বোঁ ক'রে ছুটে গেল। ভয় পেয়ে পুলিশ চলে গেল। বাড়ির একজন চাকরকে লক্ষ্য করেই পাথর ছোঁড়া হচ্ছিল। অভিজ্ঞতায় মা বুঝতে পারলেন যে ঐ চাকর এবং

বাড়ির মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো একটা বিশেষ সম্পর্ক আছে। সুতরাং চাকরটিকে বরখাস্ত করার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ব্যাপারটা থেমে গেল।

পাচক ভাট্টাল ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাঁর স্ত্রী শ্রীঅরবিন্দের কাছে ওর রোগমুক্তির প্রার্থনা জানায়। তিনি তাকে ক্ষমা করেন : "এর জন্য ওর মরার প্রয়োজন নেই।" ভাট্টাল আরোগ্যলাভ করে।

১৯২৩ খৃস্টাব্দে শিষ্যরা শ্রীঅরবিন্দের জন্মদিবস পালনের সিদ্ধান্ত নেয়। শ্রীঅরবিন্দ বলেন, "সত্যে জীবন যাপন করেই শুধু আমরা তা পালন করতে পারি।"

পরের বছর ১৯২৪ খৃস্টাব্দে তাঁর জন্মদিবসে বলেন, "আমি নীরব জ্ঞানের পথে যোগাযোগ করতেই ভালোবাসি, কারণ বাক্য মনের সঙ্গে কথা বলে ; কিন্তু নীরব জ্ঞানের মাধ্যমে গভীরতর রাজ্যে প্রবেশ করা যায়।"

দুই বছর পর ১৯২৬ খৃস্টাব্দের ২৪ নভেম্বর, অতিমানস, ভৌতিক স্তরে অভূতপূর্ব একটা ব্যাপার ঘটে। যাঁরা শ্রীঅরবিন্দের রচনার সঙ্গে পরিচিত তাঁদের কাছে এই দিনটি "সিদ্ধির দিবস" বলে পরিচিত। আশ্রমে চারদিন দর্শন হয়, তার মধ্যে এই দিনটির বিশেষ মাহাত্ম্য।

১৯২৬ খৃস্টাব্দের প্রথম থেকেই সাধকরা ক্রমেই একটা উচ্চতর শক্তির চাপ অনুভব করতে থাকেন এবং মার পরামর্শ চান।

আশ্রম যেন কার আগমন প্রত্যাশা করছিল,

আবহাওয়াতেও তার আভাস পাওয়া যায়। ১৯২৬ খৃস্টাব্দের ২৪ নভেম্বর, শিষ্যরা পূর্ব নির্দেশ অনুযায়ী বিকেলে ধ্যানসভায় এসে জমা হয়েছেন। একটা অদ্ভুত ব্যাপার, ঠিক ২৪ জন শিষ্যই এসেছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ ও মা'র পেছনের দেওয়ালে একটি পর্দা তাতে সোনালি রঙে তিনটি চীনা ড্রাগন, এম্‌ব্রয়ডারি করা। শ্রীঅরবিন্দ ও মা শিষ্যদের আশীর্বাদ করলেন। অল্প সময়ের জন্য ধ্যান করা হ'ল। আশ্রমের আবহাওরায় সব সময়েই একটা আলোর আভাস থাকে, সেদিন তা অনেক বেশি উজ্জ্বল। শ্রীঅরবিন্দ এই ঘটনাটি এইরকমভাবে বর্ণনা করেছেন।

"১৯২৬ খৃস্টাব্দের ২৪ নভেম্বর পৃথিবীতে কৃষ্ণের আবির্ভাব ঘটল। কৃষ্ণ অতিমানসিক আলোক নয়। কৃষ্ণের অবতরণের অর্থ হবে অতিমানস দেবতার আবির্ভাব···অতি-মানস ও আনন্দের অবতরণ।"

তিরিশ বছর পর ১৯৫৬ খৃস্টাব্দে পার্থিব জ্ঞানের মধ্যে অতিমানসের আবির্ভাব ঘটে।

১৯২৬ খৃস্টাব্দের নভেম্বর মাসের পরেই শ্রীঅরবিন্দ তাঁর শিষ্যদের এবং দর্শকদের সঙ্গে সমস্ত ব্যক্তিগত সম্পর্ক ত্যাগ করে নির্জন বাস আরম্ভ করেন। মা তখন আশ্রমের সমস্ত কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। শ্রীঅরবিন্দের এই নির্জনবাস অনেক সাধককে বিচলিত করে তুলল। তিনি তাঁদের আশ্বাস দিলেন, "তোমরা ভাবছ: মা তোমাদের কোনোরকম সাহায্য করতে পারবেন না···তাঁর সাহায্য থেকে তোমরা যদি লাভবান হতে না পার তা হলে দেখবে যে আমার কাছ থেকে আরো কম হচ্ছ। যাই হোক, আমার পরিবর্তে সব শিষ্য তাঁর কাছ

থেকেই আলোক ও শক্তি গ্রহণ করবে এবং তাদের আধ্যাত্মিক অগ্রগতির পথে তাঁরই নির্দেশে চলবে বলে আমি যে ব্যবস্থা করেছি তা আমার বদলানোর ইচ্ছে নেই। সাময়িক কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে আমি এই ব্যবস্থা করি নি, যা সত্য ও শিষ্যরা যদি তা গ্রহণ করতে উন্মুখ থাকেন, তবে গ্রহণ করার এটাই উপায়।"

তখন এরকম একটা ধারণা ছিল যে, শ্রীঅরবিন্দের যোগ-সাধনা নতুন কিছু নয়, প্রাচীনকালেও এরকম ছিল। তিনি যে 'অতি মানস' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করছেন এগুলিই শুধু নতুন। এই ধারণা বদলানোর জন্য শ্রীঅরবিন্দ লেখেন—"অনেকে মনে করেন যে অতীতে অসংখ্যবার এই যোগ অভ্যাস করা হয়েছে এবং স্বর্গীয় শক্তি মর্ত্যে অবতরণ করেছে এবং বার বার তা আবার চলে গেছে। এটা সত্যি বলে মনে হয় না। আমি দেখছি যে অতিমানসিক প্রকৃতিকে পৃথিবীতে আনা হয় নি, তা হলে তা এখানে থাকত। সুতরাং আমাদের চেষ্টাকে ছোটো করে দেখলে চলবে না। সফলতার পথে বাধা সৃষ্টি উচিত নয়।

অতিমানসের সাধনা চলতে থাকল। এর অবতরণের ভিত্তি তৈরি হতে থাকল।

১৯৩৫ খৃস্টাব্দে শ্রীঅরবিন্দ লেখেন, "ইতিমধ্যেই আশ্রমের পাঁচ-ছয়জনেরও বেশি সাধক ঐশী শক্তি খানিকটা উপলব্ধি করেছেন এঁদের মধ্যে কেউ বৈদান্তিক, কেউ বা ভক্তি মার্গের। এ-সবও কিছু নয়, কারণ বাইরে যা পূর্ণ উপলব্ধি এখানে তা সিদ্ধির সবে শুরু। এখানে প্রাকৃতিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক এবং শেষ পর্যন্ত অতিমানসে পরিবর্তন আনাই হল লক্ষ্য।"

১৯৩৮ খৃস্টাব্দের ২৪ নভেম্বর রাত্রি প্রায় দুটোর সময় শ্রীঅরবিন্দ তাঁর ঘরে পা পিছলে পড়ে যান এবং ডান হাঁটুটি ভেঙে যায়। দর্শন বন্ধ করে দিতে হয়।

শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, "দর্শন ইত্যাদির মতো জিনিসে শত্রু শক্তিগুলি অনেকবার বাধা দিতে চেষ্টা করেছে কিন্তু তাদের সমস্ত আক্রমণ ব্যর্থ করেছি। আমার পায়ে আঘাত লাগার সময় আমি মাকে পাহারা দিতে গিয়ে নিজের কথা ভুলে যাই। শত্রুরা আমাকেও আক্রমণ করবে তা আমি ভাবতে পারি নি। এটা আমারই ভুল।" আবার আর-এক সময় বলেন, "আমি একে সংগ্রামের একটা অংশ বলে মনে করেছি।" এই দুর্ঘটনার ফলে কয়েকজন চিকিৎসক ও শিষ্য ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে সেবা করার সুযোগ পান।

১৯২৬ খৃস্টাব্দের নভেম্বর মাস থেকে নির্জনবাস শুরু করার পর শ্রীঅরবিন্দ, ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৫ অগাস্ট এবং ২৪ নভেম্বর— বছরে এই তিনদিন দর্শন দিতেন। ১৯৩৯ খৃস্টাব্দের পর ২৪ এপ্রিলও চতুর্থ দর্শন দিবস হিসেবে যোগ করা হয়। দর্শন মেলে মার জন্মদিবসে, নিজের জন্মদিবস, সিদ্ধি দিবস এবং মার পণ্ডিচেরীতে শেষ আসার দিবসে।

একবার একজন অন্ধ সাধু দর্শনের জন্য এলে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, সে চোখেই যখন দেখতে পায় না তখন দর্শনে আসার লাভ কি? সাধু উত্তরে বলে শ্রীঅরবিন্দ যে তাঁর ঐশী দৃষ্টি আমার ওপর নিক্ষেপ করবেন সেইটেই অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কত লোক শুধু তাঁকে দেখেই তৃপ্তি পেয়েছে, তাঁর দৃষ্টি তাদের দেহ ভেদ করে গভীরে প্রবেশ করে তাদের আনন্দ দিয়েছে। তারা যে বার বার আসবে তাতে আশ্চর্য হওয়ার

কিছু নেই। তাঁকে যদি ভক্তরা মাসে একবার দর্শন করতে পারত তা হলে আরো চমৎকার হত। তাদের এই প্রার্থনা তাঁকে জানানো হয়। কিন্তু তিনি তা পূরণ করতে অস্বীকৃত হন। তিনি বলেন, "আমি যদি মাসে একবার বাইরে যাই তা হলে আমার বাইরে যাওয়ার ফল এক-তৃতীয়াংশ কমে যাবে।"

কার্যরত আধ্যাত্মিক শক্তি

বিশ্বে যা-কিছু ঘটছে সেগুলির দিকে শ্রীঅরবিন্দ সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলেন। ১৯৩৯ খৃস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় তখন তিনি এই যুদ্ধ সম্পর্কে অতটা আগ্রহ দেখান নি। কিন্তু ফরাসীরা যখন নাৎসিদের কাছে নতি স্বীকার করল এবং বৃটিশ বাহিনী ডানকার্ক হয়ে পশ্চাদপসরণ করল তখন তিনি মিত্রশক্তির পক্ষে তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তি প্রয়োগ করলেন। তিনি দেখলেন যে জার্মানদের বিজয় অভিযান প্রায় সঙ্গে সঙ্গে রুদ্ধ হয়েছে এবং যুদ্ধের গতি অন্য দিকে ঘুরে গেছে।

যাঁরা আধ্যাত্মিক জগতে যথেষ্ট এগিয়েছেন তাঁরা একটা আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জন করতে পারেন। শ্রীঅরবিন্দ প্রথম দিকে সীমিত ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত কাজের জন্য এবং পরে অবিরাম-ভাবে বিশ্বশক্তির ওপর তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তি প্রয়োগ করেন।

১৯৪৪ খৃস্টাব্দের ১৩ মার্চ শ্রীঅরবিন্দ একজন শিষ্যকে লেখেন, "আমার শক্তি নিশ্চয়ই কেবলমাত্র আশ্রম এবং অবস্থার উন্নতি সম্পর্কেই সীমাবদ্ধ নয়। তুমি জান যে যুদ্ধের যুক্তিসংগত সমাধান এবং মানবজগতে পরিবর্তন আনতে এই শক্তি অনেক-খানি প্রয়োগ করা হচ্ছে।"

তাঁর আর-একজন শিষ্যের কাছে আর-একটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন, "এটাকে কয়েকটি জাতির অন্য জাতির বিরুদ্ধে অথবা ভারতের জন্য সংগ্রাম বলে মনে করা উচিত নয়। পৃথিবীতে মানবসমাজের সামনে একটা আদর্শ স্থাপনের জন্যই এ সংগ্রাম, অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবী এবং মানবজাতিকে যে অন্ধকার ও

অসত্য ঘিরে ফেলতে চাইছে তার বিরুদ্ধে এবং যে সত্য এখনো সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধ হয় নি তাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই এই সংগ্রাম। সংগ্রামের পেছনে যে শক্তি রয়েছে তা দেখতে হবে, ওপরে ওপরে বিচার করলে চলবে না।··· এক পক্ষ যদি জয়লাভ করে, তা হলে স্বাধীনতা, আলোক এবং সত্যের আশা শেষ হয়ে যাবে এবং যে কাজ করতে হবে তা এমন সব শর্তাধীন থাকবে যা মানুষের পক্ষে পালন করা অসাধ্য, অসত্য এবং অন্ধকারের রাজত্ব শুরু হবে, বেশির ভাগ মানুষ নিষ্ঠুর শোষণ এবং অপমানে জর্জরিত হবে, যা এই দেশ স্বপ্নেও ভাবতে পারে না এবং এখনো বুঝতে পারে না। অন্য যে পক্ষ মানবজাতির স্বাধীন ভবিষ্যৎ প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে সেই পক্ষ যদি জয়লাভ করে তা হলে এই ভীষণ বিপদ এড়ানো যাবে এবং ভগবানের কাজ করার এবং পৃথিবীতে আধ্যাত্মিক শক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করার যে লক্ষ্য আমরা গ্রহণ করেছি তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাওয়া যাবে। যাঁরা এই আদর্শের জন্য এবং অসুরের রাজ্য প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে তাঁদের ওপরেই ভগবানের আশীর্বাদ।"

শ্রীঅরবিন্দ যুদ্ধ তহবিলে সাহায্য করেন। ১৯৪২ খৃস্টাব্দে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপ্‌স যখন যুদ্ধের পর ভারতকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস দেওয়ার প্রস্তাব নিয়ে আসেন তখন তিনি তা গ্রহণ করার পরামর্শ দেন। ভারতীয় নেতারা তখন অবশ্য সেই পরামর্শে কান দেন নি। আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে আধ্যাত্মিক শক্তি প্রয়োগ করার ওপরেই শ্রীঅরবিন্দের আস্থা ছিল। জাপান, ভারত আক্রমণ ক'রে এই দেশ অধিকার করতে চায়, এটা বোঝার আগে পর্যন্ত নানা কারণে তিনি

জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তি প্রয়োগ করেন নি। তিনি দেখলেন, বিজয়ী জাপানের সামনে এখন বিপরীত স্রোত এবং জাপান চরম পরাজয় বরণ করে। তিনি ভারতের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁর উপলব্ধি সফল হতে দেখেছেন এবং আভ্যন্তরীণ নানা গোলযোগ সত্ত্বেও ভারত স্বাধীন রয়েছে।

তিনি লিখেছেন : "বাহ্যিক পরিচালনার তুলনায় আত্মিক পরিচালনা লক্ষ লক্ষ গুণে সহজ। মনে করা যাক আমি চাই যে সেনাপতি ক. খ., -র বাহিনীকে পরাজিত করে পালাতে পাঠিয়ে দিক। আমি তার ওপর উপযুক্ত শক্তি প্রয়োগ করলাম, সে জেগে উঠল এবং সে তার সামরিক জ্ঞান ও ক্ষমতা নিয়ে উপযুক্ত কাজ করল এবং প্রয়োজনীয় ফল পাওয়া গেল। কিন্তু আমার মধ্যে যদি প্রচ্ছন্নভাবে সামরিক কৌশল সম্পর্কে জ্ঞান না থাকে এবং তাকে আমি এটা ওটা করতে বলি তা হলে সে তা করবে না এবং আমিও তা করতে পারব না। এটা হল জ্ঞানের দুটি বিভিন্ন স্তরের কাজ।"

অন্যান্য ব্যাপারেও তিনি নীরবে তাঁর শক্তি প্রয়োগ করেন। তাঁর নিজের কথাতেই রয়েছে, "স্পেনে আমি অত্যন্ত চমৎকার-ভাবে সফল হয়েছিলাম। এই কাজ করার জন্য সেনাপতি মিয়াকা খুব সুন্দর একটি আধার ছিলেন। ভালো আধারের ওপর এই শক্তির রূপায়ন নির্ভর করে। আধার হিসেবে বাঙ্কের ওপর নির্ভর করা যেত না। ন্যাগাসের ছিল ভালো আধার, কিন্তু তিনি যাদের পরিচালনা করছিলেন তারা ভালো যোদ্ধা হলেও সংগঠিত ছিল না। মিশর সফল হয় নি। আয়ার্ল্যাণ্ড এবং তুরস্ক অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে। বাংলাদেশে আমি

ডিসেম্বর, 1950 খৃঃ অঃ। মহাসমাধি
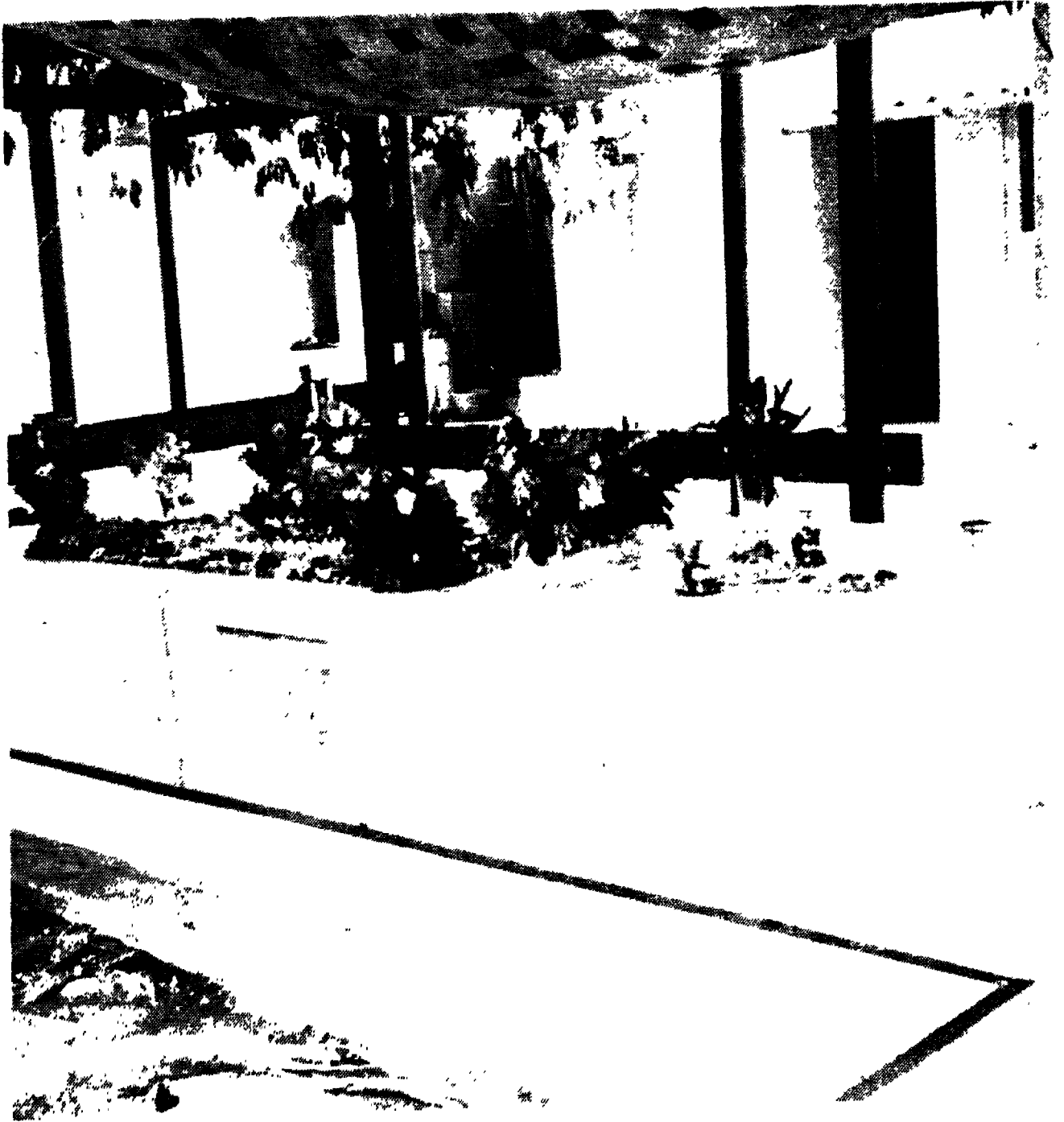
পণ্ডিচেরী আশ্রমে শ্রীঅরবিন্দের সমাধি

আশ্রমের প্রধান ভবনগুলি
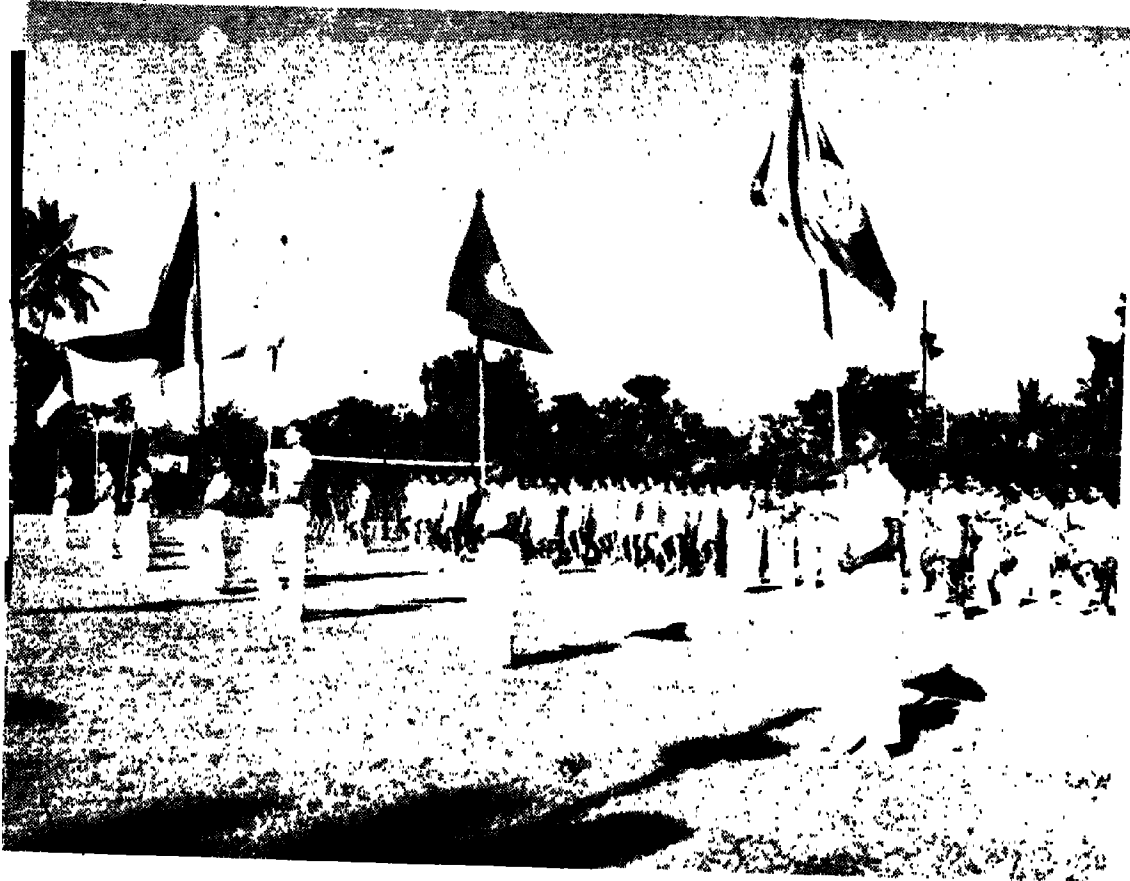
আশ্রমের খেলাধূলার মাঠে—শ্রীঅরবিন্দ আন্তর্জাতিক শিক্ষা-
কেন্দ্রের বার্ষিকী উপলক্ষে পয়লা ডিসেম্বর কুচকাওয়াজ

একজন স্থপতি-কৃত ভবিষ্যতের সবমানবের সহর অরোভিলের একটি নক্সা

উপায়ে এই বিভেদ দূর করতে হবে ; একতা অর্জন করতেই হবে, কারণ ভারতের মহান ভবিষ্যতের জন্য এটা প্রয়োজন।

"আর-একটা স্বপ্ন ছিল এশিয়ার পুনরুত্থান। এশিয়া যাতে মানবসভ্যতার অগ্রগতিতে তার মহান ভূমিকা আবার গ্রহণ করতে পারে সেই স্বপ্ন। এশিয়া জেগেছে ; এর অনেকখানি অংশ এখন সম্পূর্ণ স্বাধীন বা স্বাধীনতা লাভ করছে। অন্য যে অংশগুলি এখনো পরাধীন সেগুলিও স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছে।"

"তৃতীয় স্বপ্নটি ছিল, সমগ্র মানবজাতির উজ্জ্বলতর, মহত্তর ও উন্নততর জীবনের জন্য একটা বিশ্ব ইউনিয়ন স্থাপন।"

"মানবজাতির মধ্যে একতা স্থাপনের একটা নতুন মনোভাব গড়ে উঠবে।"

"বিশ্বকে ভারতের আধ্যাত্মিক দান সম্পর্কে আর-একটি স্বপ্ন ইতিমধ্যেই সফল হতে শুরু করেছে। ভারতের আধ্যাত্মিকতা ইউরোপ ও আমেরিকায় ক্রমশই বেশি পরিমাণে প্রবেশ করছে।"

"শেষ স্বপ্নটি ছিল বিবর্তন সম্পর্কে। এই বিবর্তন মানুষকে উচ্চতর ও ব্যাপকতর জ্ঞানের স্তরে উন্নীত করবে। মানুষ প্রথম যখন চিন্তা করতে শিখল তখন থেকেই যে সমস্যাগুলি তাকে বিব্রত করে তুলেছিল এবং ব্যক্তিগত পরিপূর্ণতা ও নিখুঁত সমাজ গঠন সম্পর্কে যে স্বপ্ন সে দেখেছিল মানুষ তার সমাধান করবে।"

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে অতিমানসের অবতরণ

১৯৫০ খৃস্টাব্দের ৫ ডিসেম্বর রাত্রি ১-২৬ মিনিটে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর মরদেহ ত্যাগ করেন। একটা ঘনীভূত অলৌকিক আলো দেহটিকে ঘিরে থাকায় তা ১১১ ঘণ্টারও বেশি উজ্জ্বল থাকে। অতিমানসকে বাস্তব জগতে ফিরিয়ে আনার জন্যই তিনি মরদেহ ত্যাগ করেছেন।

মা ঘোষণা করলেন: "আজ শ্রীঅরবিন্দের মরদেহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হয় নি। তাঁর দেহ ঘনীভূত অলৌকিক আলোতে এমনভাবে ঘিরে আছে যে পচনের কোনো চিহ্নই দেখা যায় না। যতদিন তা ঠিক থাকে ততদিন দেহটি তাঁর শয্যাতেই শয়ান থাকবে।"

এই সময়ে মা অন্য যে-সব ঘোষণা করেন সেগুলির মধ্যে একটি ছিল:

"প্রভু, আজ সকালেই আপনি আমাকে আশ্বাস দিয়েছেন যে আপনার কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আপনি শুধু নির্দেশদাতা এবং আলোকদাতা হিসেবেই নয়, সক্রিয়ভাবে আমাদের সঙ্গে থাকবেন। আপনি আশ্বাস দিয়েছেন যে আপনি এখানে থাকবেন এবং পৃথিবী রূপান্তরিত না হওয়া পর্যন্ত পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল পরিত্যাগ করবেন না। আমরা যাতে আপনার এই অলৌকিক উপস্থিতির উপযুক্ত হতে পারি এবং আপনার মহান কর্তব্য সম্পাদন করার উদ্দেশ্যে নিজেদের সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করতে পারি সেই আশীর্বাদ করুন।"

"আমি যখন তাঁকে পুনরুত্থানের অনুরোধ জানালাম তখন তিনি পরিষ্কার উত্তর দিলেন : "আমি ইচ্ছা করেই দেহটি ত্যাগ করেছি। পুনরায় এটাকে গ্রহণ করব না। প্রথম অতি-মানসিক দেহে আমি আবার প্রকাশিত হব।"

"তাঁর পরিবর্তনের কাজে আরো পূর্ণভাবে সাহায্য করার জন্য যিনি নিজের স্থূল জীবন বিসর্জন দিয়েছেন, তাঁর সম্মুখে আমরা দাঁড়িয়ে আছি।"

৯ই ডিসেম্বর যখন দেহ থেকে আলো চলে যেতে থাকল, তখন মরদেহটি একটি গোলাপ কাঠের কাস্কেটে শায়িত ক'রে সেবাবৃক্ষের নীচে আশ্রমের আঙিনায় রাখা হল। এই সমাধি সাধকদের ধ্যান ও উপলব্ধির আশ্রয়স্থল এবং সমগ্র বিশ্বের দর্শনার্থীদের তীর্থস্থান।

মা বলেছেন, "বিশ্বের জন্য তিনি যে কী বিপুল ত্যাগ করেছেন তা লোকেরা জানে না। প্রায় একবছর আগে আমরা নানা কথা নিয়ে আলোচনা করছিলাম। আমি বলেছিলাম, আমার এই দেহটা ত্যাগ করতে ইচ্ছে করছে। তিনি খুব দৃঢ় স্বরে বললেন, 'না, কিছুতেই হতে পারে না। যদি প্রয়োজন হয় আমি যেতে পারি। তোমাকে অতিমানসের রূপান্তরের জন্য তোমার যোগ পূর্ণ করতে হবে।'"

মা বলেছেন, পৃথিবীর সন্নিকট অঞ্চলেই শ্রীঅরবিন্দের স্থায়ী নিবাস রয়েছে। যাঁরা দেখা করতে চান তাঁরা সেখানে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারেন। সেই সূক্ষ্ম বায়ুমণ্ডলে, তাঁর দেহ পৃথিবীতে যে রকম ছিল সেই রকমই আছে তবে তা অমরত্বের অলৌকিক শান্তিতে পরিপূর্ণ।

প্রাকৃতিক এবং অতি প্রাকৃতিক স্তরে সাধনা ও কাজ চলতে থাকল। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর দেহ পরিত্যাগ করে যাওয়ার ছয় বছর পর এক অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটল। [illegible] একটা গুজব রটল যে ১৯৫৬ সালটি বিশেষ করে ঐ বছরের ২৩ এপ্রিল দিনটি অত্যন্ত [illegible] বহুদিন যাবৎ প্রত্যাশিত অতিমানস [illegible] অবশ্য দুই মাস পূর্বে ১৯৫৬ খৃস্টাব্দের ২৯ ফেব্রুয়ারি ঘটে গেছে। মা সেই ঘটনাটি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন :

"এই সন্ধেবেলা ভগবান বাস্তবরূপে তোমাদের মাঝে অবস্থিত ছিলেন। বিশ্ব থেকেও বড়ো একটা জীবন্ত [illegible] গোলকের অবয়ব আমার সামনে ছিল এবং ভগবান ও বিশ্বের মাঝখানে ছিল বিরাট আকারের একটা সোনার দরজা। আমি যখন দরজার দিকে তাকালাম তখনই বুঝতে পারলাম এবং জ্ঞানের একটি আন্দোলনে ইচ্ছা করলাম 'সময় হয়েছে'; তার পর একটা মস্ত বড়ো সোনার হাতুড়ি দুই হাতে ধরে দরজায় কেবলমাত্র একটি আঘাত করলাম। দরজাটি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। অতিমানসিক আলো, শক্তি ও জ্ঞান অবাধ প্রবাহে পৃথিবীতে নেমে আসতে লাগল।" ১৯৫৬ খৃস্টাব্দের ২৪ এপ্রিল মা বিশেষ করে বলেন, "পৃথিবীতে অতি-মানসিকের প্রকাশ এখন আর কেবলমাত্র অঙ্গীকার নয়, এটা সত্য ও বাস্তব। এটা এখানে কাজ করছে এবং এমন একটা দিন আসবে যখন অতি অন্ধ, অতি অজ্ঞান, এমন-কি, অতি অনিচ্ছুকও একে স্বীকার করতে বাধ্য হবে।" মা এই বাণীটিও দিয়েছেন :

প্রভু আপনার ইচ্ছানুয়ায়ী আমি কাজ করেছি
এক নতুন আলো পৃথিবীতে প্রকাশিত
জন্ম হয়েছে এক নতুন বিশ্বের।
যে-সব অঙ্গীকার করা হয়েছিল,
তা পূরণ করা হয়েছে।

চার বছর পর ১৯৬০ খৃস্টাব্দের ২৯ ফেব্রুয়ারি, মা বলেন : "এর পর থেকে ২৯ ফেব্রুয়ারি হবে প্রভুর দিবস।"

শ্রীঅরবিন্দ যা বলেছেন আসুন তা আমরা আবার স্মরণ করি : "আমরা যা করছি তাতে যদি সফল হই তা হলে তা হবে শুরু, সম্পূর্ণতা নয়। এটা পৃথিবীতে একটা নতুন জ্ঞানের ভিত্তি— তার প্রকাশের অসংখ্য সম্ভাবনা।"

শ্রীঅরবিন্দ যা বলেছিলেন সে-সম্পর্কে একজন শিষ্য একবার মার মনোযোগ আকর্ষণ করেন। একবার তিনি বলেছিলেন, "১৯৬৭ খৃস্টাব্দে অতিমানসিক জ্ঞান একটা নিষ্পন্নকারী শক্তি পর্যায়ে প্রবেশ করবে। এই নিষ্পন্নকারী শক্তিটা কী শিষ্য তা জানতে চাইলেন। মা উত্তরে বললেন, "মানুষের মনের ওপর এবং ঘটনার গতির ওপর সন্দেহাতীত ভাবে কাজ।" আলোচনাটি এইরকম ছিল :

শিষ্য : মার জড়দেহের ওপর এই শক্তির কোনো প্রতিক্রিয়া হয় কিনা এবং অন্যান্য ও সাধারণ বিশ্বের ওপরে এবং বর্তমান বিশ্বের অমীমাংসিত সমস্যাগুলির ওপর এর কোনো প্রতিক্রিয়া হবে কিনা ?

মা : আমরা একটু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করলেই দেখতে পাব।

একটা অতিমানসিক ভবিষ্যৎ

এখানে মা'র রচনার সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি দেওয়া হল যেগুলি অতিমানসিক ভবিষ্যতের কয়েকটি ক্ষেত্রে আলোকপাত করবে।

১৯৫৮ : "পুরাতনের মধ্যে একেবারে নতুন সৃষ্টির অর্থাৎ অন্তর্বর্তী ও অতিমানবের আবির্ভাবের পথ সুগম করার জন্য এবং নতুন সৃষ্টির সঙ্গে মানুষের সজ্ঞান সম্পর্ক স্থাপনের জন্য পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের প্রায় সর্বত্র এখন অতিমানসিক বস্তু ছড়িয়ে আছে।"

"সমস্ত রকম প্রাকৃতিক অবনতি, দৈহিক দুঃখকষ্ট, অসুন্দরতা, প্রত্যেক জীবে যে সৌন্দর্য আছে তা প্রকাশে ব্যর্থতা— এগুলি আমার কাছে এখনো অসহ্য বলে মনে হয়। তবে এগুলিও একদিন জয় করা যাবে··· মানুষ যত বস্তুর মধ্যে অবতরণ করতে চাইবে ততই তাকে জ্ঞানের উচ্চমার্গে উঠতে হবে।"

"বিশ্বের বিবর্তনে, পরবর্তী ধাপ হ'ল অতিমানসিক জীবন। নিশ্চিতরূপে এই জীবন শুরু হয়েছে, বাহ্যত নয়; বুদ্ধিমূলক প্রচেষ্টার মাধ্যমে এই অতিমানসিক জীবনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার পথ যে খুব কঠিন তা ক্রমশ স্পষ্টতর হচ্ছে।"

"বিশ্বে এই যে নতুন বস্তু ব্যাপৃত হচ্ছে এবং কাজ করছে তাতে এমন প্রচণ্ড একটা শক্তি ও আনন্দ আছে যে এর পাশে

সমস্ত রকম জ্ঞানের প্রচেষ্টা শুষ্ক ও নীরস বলে মনে হয়। সেইজন্যই এই-সব ব্যাপার যত কম বলা যায় ততই ভালো।"

"গভীর ও সত্য প্রেমের একটি ঢেউ, ভগবানের সঙ্গে এক মিনিট, এক মুহূর্তের গভীর যোগাযোগ; সবরকম সম্ভাব্য ব্যাখ্যার তুলনায় তোমাকে অনেক তাড়াতাড়ি তোমার লক্ষ্যের কাছে নিয়ে যাবে।"

"এমন কথাও বলা যায় যে অতি সূক্ষ্ম ব্যাখ্যার তুলনায়, পরিশুদ্ধ, সূক্ষ্ম, স্বচ্ছ, উজ্জ্বল ও গভীর অনুভূতি, তোমাদের কাছে দুয়ার অনেক বেশি খুলে দেয়। আমরা যদি এই অভিজ্ঞতার পরিমাণ আরো একটু বাড়াতে পারি, অর্থাৎ যখন দেহের রূপান্তর ঘটানোর কাজ শুরু করবে, যখন দেহের কতকগুলি কোষ অন্যগুলির তুলনায় আরো সূক্ষ্ম, শুদ্ধ ও মননশীল হয়ে উঠবে তখন সঠিকভাবে ভগবানের উপস্থিতি, ঐশী ইচ্ছা ও ঐশী শক্তি অনুভব করতে পারবে। যে জ্ঞান বুদ্ধিজাত নয়, স্বরূপতাজাত, সেই জ্ঞান যখন তুমি তোমার দেহের কোষগুলিতেও অনুভব করবে, তখন সেই জ্ঞান এত সম্পূর্ণ, এত জীবন্ত, বাস্তব ও অলঙ্ঘনীয় যে তার কাছে অন্য সব-কিছু অলীক স্বপ্ন বলে মনে হবে।"

"মনে হবে যে মানুষ যতদিন তার নিজের দেহ দিয়ে না বোঝে ততদিন কিছুই প্রকৃতভাবে বোঝা যায় না।"

১৯৫৯: "এই মুহূর্তে তোমরা যে সজ্ঞানে বা নির্জ্ঞানে, এমনকি, স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় এই পৃথিবীতে বেঁচে রয়েছ তাতেই

প্রমাণিত হচ্ছে যে, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে যে অতিপার্থিব জিনিস ছড়িয়ে পড়ছে তা নিশ্বাসবায়ুর সঙ্গে গ্রহণ করছ। এগুলি এমন জিনিস তৈরি করছে যা হঠাৎ প্রকাশিত হবে। তোমরা সুনিশ্চিত ব্যবস্থা গ্রহণ করলেই তা প্রকাশিত হবে।"

১৯৬১ : "দুটি অবিসম্বাদিত চিহ্ন প্রমাণ দেয় যে কারো অতিমানসিকের সঙ্গে সংযোগ আছে কিনা : ১. একটি নিখুঁত ও স্থায়ী সাম্য, ২. জ্ঞানে পরিপূর্ণ নিশ্চয়তা।"

"সম্পূর্ণ নিখুঁত জ্ঞান বলে এই সাম্যতার সমস্ত অবস্থায়, সমস্ত ঘটনায়, [illegible] সমস্ত [illegible] অবিকৃত, স্বতঃস্ফূর্ত ও সহজ হবে।"

১৯৬৩ : প্রশ্ন : অতিমানসিক শক্তি যখন পৃথিবীতে অবতরণ করেছে তখন জন্মের মাধ্যম ছাড়াও কি সোজাসুজি রূপান্তর সম্ভবপর ?

উত্তর : "এটা কি সম্ভব ? সব কিছুই সম্ভবপর। তুমি কি জানতে চাও ? সেটা কি ইতিমধ্যেই হয়েছে ?"

"হ্যাঁ।"

উত্তর : "অত্যন্ত বাস্তবে এখনো হয় নি ; তবে সূক্ষ্ম প্রকৃতিতে দেখা যায়, হ্যাঁ, দৈহিক ও সূক্ষ্ম দৈহিক অনুভূতির মাঝখানে অন্তর্বর্তী অনুভূতি দিয়ে তা দেখা যায়। সূক্ষ্ম দেহ এমন একটা অনুভূতি যার সঙ্গে, নিশ্বাসবায়ুর, হালকা বাতাস, হালকা সুগন্ধের তুলনা করা যায়। কাজেই যাঁদের অন্তর্দৃষ্টি আছে তাঁরাই শুধু দেখতে পায়। আমরা সাধারণভাবে স্থূলদৃষ্টিতে যেরকমভাবে দেখতে পাই, এগুলি সেই রকম

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। তবে তা অনুভব করা যায়, এমন-কি, দৃষ্টিগ্রাহ্যও হয়, কিন্তু তা খুব ক্ষণস্থায়ী। বস্তুর দৃঢ়তা এবং স্থিরতা পাওয়া যায় না।”

“বিবেকানন্দকে শিবের বিভূতি (অংশ) বলা হয় ; কিন্তু শিব পরিষ্কারভাবে তাঁর মনোবাঞ্ছা ব্যক্ত করেছেন যে তিনি কেবল অতিমানসিক জগতের পৃথিবীতে আবির্ভূত হবেন। পৃথিবী যখন অতিমানসিক জীবনের জন্য তৈরি হবে তখনই তিনি আসবেন। তাঁরা প্রায় সকলেই উপযুক্ত মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করছেন। সময় হলেই তাঁরা নিজেদের প্রকাশ করবেন। তাঁরা সংগ্রাম চান না এবং বর্তমানের অস্পষ্টতা চান না।”

১৯৬৬ : “লোকেদের হাতে সময় নেই। তারা অবিলম্বে ফলাফল দেখতে চায়। তারা বিশ্বাস করে যে তারা অতি-মানসিককে নিম্নাভিমুখে টেনে আনছে— কিন্তু তারা আসলে কোনো ক্ষুদ্র শক্তিকে নীচে অবতরণ করায়। তিনিও তাদের সঙ্গে ক্রীড়ায় মত্ত হন এবং পরিশেষে তারা কিছুটা হতাশ হতে বাধ্য হয়।”

“কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ যাকে ‘অতিমানসিক’ বলেছেন সেই সত্যিকারের শক্তি, মানবসমাজ সমস্ত রকম আত্মাভিমান বর্জন না করা পর্যন্ত প্রকাশিত হতে পারে না। কেবলমাত্র সেই ক্ষেত্রে এর অপপ্রয়োগের বিপদ থাকবে না। যে মানুষ নিজের অন্তরকে সম্পূর্ণভাবে বিশ্লিষ্ট করতে সক্ষম হবেন সেই রকম কোনো ব্যক্তির মাধ্যম ছাড়া এই শক্তি নিজেকে প্রকাশ

করবেন না। আমি তোমাদের বলেছি যে শ্রীঅরবিন্দ আমাদের কাছ থেকে এই সাফল্যই আশা করেছেন। তোমরা হয়তো বলবে যে এটা খুব কঠিন কাজ। কিন্তু আমি বলছি যে আমরা এখানে সহজ কোনো কাজ করার জন্য আসি নি; আমরা এসেছি কঠিন কাজ সম্পূর্ণ করতে।"

১৯৬৮: একই সঙ্গে সর্বত্র, সমগ্র দেহের ভেতর দিয়ে শক্তিশালী অতিমানসিক শক্তিগুলি অবিরামভাবে প্রবেশ করছে যেন সমগ্র দেহ এগুলিতে অবগাহণ করছে। মস্তিষ্ক থেকে কণ্ঠ পর্যন্ত প্রদেশটিতে এই শক্তিগুলির প্রতিক্রিয়া কম। (১৯৬৮ খৃস্টাব্দের ২৬।২৭ নভেম্বর তারিখে একটি চিঠিতে এই কথা লেখেন)।

১৯৬৯: ১৯৬৯ সালের ১লা জানুয়ারি রাত্রি ২টার সময় জ্ঞানের একটি শিখা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে অবতরণ ক'রে সেই-খানেই থেকে যায়। আলো, শক্তি, বেগ, আনন্দ ও শান্তিতে পরিপূর্ণ এই শিখাটির অলৌকিক অবতরণ এবং এটি সমগ্র পৃথিবী ব্যাপ্ত করে।"

"এক নতুন সৃষ্টি অর্থাৎ অতিমানব সম্পর্কে মানবসমাজকে প্রস্তুত করার জন্য এই বছরের শুরু থেকেই এক নতুন জ্ঞান পৃথিবীতে কাজ আরম্ভ করেছে। এই সৃষ্টিকে সম্ভব ক'রে তুলতে হলে, মানুষের দেহ যে-সব বস্তু দিয়ে তৈরি সেগুলিতে এক বিরাট পরিবর্তন আনতে হবে। এই দেহ এমন হওয়া উচিত যা জ্ঞানকে সহজে গ্রহণ করতে পারবে, এমন নমনীয় হওয়া প্রয়োজন যা দিয়ে সহজে কাজ করানো যাবে।"

"অতিমানসিক সৃষ্টিতে কোনো ধর্ম থাকবে না। সমগ্র জীবন হবে স্বর্গীয় ঐক্যের প্রকাশ এবং তারই ফল। মানুষ বর্তমানে যাঁদের দেবতা বলে, তাঁরাও থাকবেন না। স্বর্গের এই মহান দেবতারা নিজেরাই নতুন সৃষ্টিতে অংশ গ্রহণ করতে পারবেন, কিন্তু তার জন্য, আমরা পৃথিবীতে যেগুলিকে অতিমানসিক বস্তু বলি, তাঁদের সেগুলি পরিধান ক'রে নিতে হবে। এখন যেমন বিশ্বে জীব রয়েছে, তাদের মধ্যে কিছু যদি নিজেদের বিশ্বেই থেকে যেতে চায়, তারা যদি দৈহিক দিক থেকে নিজেদের প্রকাশ করতে না চায় তা হলে তাদের সঙ্গে, পৃথিবীর অতিমানসিক বিশ্বের সৌহার্দ্যের, সহযোগিতার ও সাম্যের সম্পর্ক থাকবে। কারণ তখন উচ্চতম স্বর্গীয় গুণগুলি, পৃথিবীর অতিমানসিক বিশ্বের মানুষের মধ্যেও প্রতিভাত হবে।"

"প্রাকৃতিক বস্তু যখন অতিমানসিক বস্তুতে রূপান্তরিত হবে, তখন পৃথিবীতে কোনো দেহে জন্মগ্রহণ করাটা হীনতার কারণ না হয়ে বরং উল্টোটাই হবে ; কারণ তখন এখানে যে প্রাচুর্য থাকবে তা আর কোনো রকমে পাওয়া সম্ভবপর হবে না।"

"এগুলি অদূর ভবিষ্যতে ঘটবে। এই ভবিষ্যৎ শুরু হয়ে গেছে। তবে এই ভবিষ্যতের রূপ গ্রহণ করতে কিছুটা সময় লাগবে। ইতিমধ্যে, আমরা একটা বিশেষ অবস্থার মধ্যে রয়েছি। এই অবস্থাটা অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এর কোনো দৃষ্টান্ত নেই। আমরা এক নতুন বিশ্বের জন্মক্ষণে উপস্থিত— যে বিশ্ব একেবারে শিশু, একেবারে দুর্বল। এই দুর্বলতা

বাইরের প্রকাশে, মূলে নয়। এই বিশ্বকে এখনো কেউ চিনতে পারে নি, এখনো অনুভব করতে পারে নি। বেশির ভাগই অস্বীকার করছে, কিন্তু তার কাজ শুরু হয়ে গেছে। সে রয়েছে, বাড়তে চেষ্টা করছে। সে তার ফল সম্পর্কে সুনিশ্চিত। কিন্তু সেখানে পৌঁছবার রাস্তা নতুন; কেউ সেই পথ দেখে নি; কেউ সেই পথে হাঁটে নি, কেউ সেই পথে যায় নি। এটা হচ্ছে আরম্ভ, বিশ্বব্যাপী আরম্ভ। কাজেই এই যাত্রা সম্পূর্ণ অভাবিত এবং ভবিষ্যৎ অজ্ঞাত।"

গুরু এবং পথনির্দেশক

"শিক্ষা, দৃষ্টান্ত, প্রভাব"—এই তিনটি ছিল গুরু শ্রীঅরবিন্দের সাধনা।

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা বারীনের কাছে ১৯২০ খৃস্টাব্দের ৭ এপ্রিল যে চিঠি লেখেন তাতে গুরুর স্থান সম্পর্কে কিছুটা জানা যায়: প্রথমত তোমার যোগ সম্পর্কে লিখছি। তুমি আমার ওপর তোমার যোগের ভার দিতে চাও। আমি তা নিতে রাজী আছি অর্থাৎ যিনি প্রকাশ্যে হোক বা গোপনে হোক তাঁর দৈব শক্তি দিয়ে তোমাকে আমাকে চালাচ্ছেন, তাঁকে দিতে রাজী আছি। কিন্তু তার ফল হবে এই যে, ভগবান আমাকে যে বিশেষ উপায় দিয়েছেন যাকে আমি অখণ্ড যোগ বলি, তোমাকেও সেই বিশেষ পথ অনুসরণ করতে হবে।

আর-একটি ক্ষেত্রেও শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন যে "যিনি জ্ঞানের উচ্চতর মার্গে আরোহণ করেছেন, যাঁকে উচ্চতর জ্ঞানের প্রকাশ বা প্রতিনিধি বলে মনে করা হয় তিনিই হলেন গুরু। তিনি যে শুধু শিক্ষা দিয়ে এবং তার চাইতেও বেশি প্রভাব দিয়ে সাহায্য করেন তাই নয়, নিজের অভিজ্ঞতা অন্যের মধ্যে সংক্রামিত করার শক্তি দিয়েও সাহায্য করেন।"

আধ্যাত্মিক নির্দেশের ক্ষেত্রে শ্রীঅরবিন্দের মতো মা'র ভূমিকাও এক। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন যে 'তাঁর জ্ঞান ও শক্তির সাহায্য ছাড়া কিছুই করা যায় না। কেউ যদি বাস্তবিকই তাঁর জ্ঞান অর্জন করেন তা হলে তাঁর জানা উচিত যে আমি

সেই জ্ঞানের পেছনে আছি এবং কেউ যদি আমাকে অনুভব করেন, তা হলে তিনিও তার পেছনে আছেন।'

সমস্ত রকম যোগাভ্যাসে, বিশেষ করে অখণ্ড যোগে, গুরুর প্রেরণা এবং কঠিন স্তরগুলিতে তাঁর নিয়ন্ত্রণ ও উপস্থিতি একান্ত আবশ্যক। তা না হ'লে হোঁচট না খেয়ে ভুল না করে সফল হওয়া অসম্ভব। আর ভুল হলেই সাফল্যের সব সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। শ্রীঅরবিন্দের চিঠিপত্র এবং সান্ধ্য আলোচনা থেকে, শিষ্যদের তিনি কতখানি সাহায্য করেছেন তার সামান্য আভাস মাত্র পাওয়া যায়। তিনি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অন্তরের মাধ্যমে যোগাযোগ ক'রে সাহায্য করতেন।

শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন যে 'গুরু হলেন সেই ব্যক্তি যিনি তাঁর ভাইদের সাহায্য করছেন। একটি শিশু, শিশুর দলকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। একটি আলো অন্যান্য আলোগুলি প্রজ্বলিত করছে। একটি জাগ্রত আত্মা, আত্মাগুলিকে জাগিয়ে দিচ্ছে।' তিনি সর্বক্ষণ এই কাজই করতেন। এই পথের সমস্ত বন্ধুরতা তিনি শিষ্যদের জানিয়ে দিতেন।

তিনি তাঁর একটি চিঠিতে বুঝিয়ে বলেছেন : "এখানকার যোগাভ্যাসের উদ্দেশ্য অন্যান্য যোগের তুলনায় ভিন্ন। এর লক্ষ্য শুধুমাত্র সাধারণ অজ্ঞ, স্থূল, বিশ্ববোধ থেকে উর্ধ্বে ওঠাই নয়, সেই ঐশী জ্ঞানের অতিমানসিক শক্তিকে মন, জীবন ও দেহে নামিয়ে এনে তার রূপান্তর ঘটিয়ে, পৃথিবীতে ভগবানের স্বরূপ প্রকাশ করা এবং বস্তুতে ঐশী জীবন সৃষ্টি করাই হল এর লক্ষ্য। এটা অত্যন্ত কঠিন লক্ষ্য। এর জন্য অত্যন্ত কঠোর যোগের প্রয়োজন। অনেকের কাছে অথবা

বেশির ভাগের কাছেই এটা অসম্ভব বলে মনে হবে। সাধারণ অজ্ঞ বিজ্ঞানের সমস্ত প্রতিষ্ঠিত শক্তিগুলি এর বিরোধিতা করে, এবং একে প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করে। সাধকও দেখতে পান যে এই লক্ষ্য পূরণ করার পথে তাঁর নিজের দেহ, মন ও জীবন সবচাইতে বেশি বাধার সৃষ্টি করছে। তোমরা যদি সর্বান্তঃকরণে এই আদর্শ গ্রহণ করতে পার তা হলে সমস্ত বাধা অতিক্রম করো, অতীত এবং তার বন্ধনগুলিকে পেছনে ফেলে দাও। এই স্বর্গীয় সম্ভাবনার জন্য সমস্ত-কিছু ত্যাগ করতে, সমস্ত দুঃখ বরণ করতে তৈরি থাকো। তা হলেই শুধু তোমরা এগুলির পশ্চাতের সত্যকে অভিজ্ঞতার সাহায্যে আবিষ্কার করতে পারবে।"

এই যোগসাধনায় প্রেরণা, অন্তরে ও বাইরে গভীর মনোনিবেশ, কোনো প্রভাবের প্রতি মনঃসংযোগ, আমাদের ওপরে যে স্বর্গীয় শক্তি আছে সেই শক্তি ও তার কর্মধারা, হৃদয়ে ভগবানের অস্তিত্ব এবং এগুলির সঙ্গে সম্পর্কবিহীন সব-কিছু পরিত্যাগ করে এগিয়ে যেতে হয়। এটা কোনো নির্দিষ্ট মানসিক শিক্ষা বা নির্ধারিত ধ্যান মন্ত্র বা অন্য কিছুর মাধ্যমে এগিয়ে চলে না। বিশ্বাস, উচ্চাশা ও সমর্পণের মাধ্যমেই শুধু আত্মার পথ উন্মুক্ত করা যেতে পারে।

শ্রীঅরবিন্দ চেয়েছিলেন পার্থিব উপলব্ধি। তিনি চেয়েছিলেন স্বর্গ এই বিশ্বকে জয় করুক, বিশ্বের সমস্ত গতি স্বর্গীয় হোক, ভগবান এখানেই প্রকাশিত হোন। তাঁর নিজের উপলব্ধি ছিল, বিশ্বের জ্ঞানের ওপর অতি-মানসিকতার জ্ঞানের দ্বার খুলে দেওয়ার চাবি মাত্র। এই মহান কার্যে সহযোগিতার ক্ষেত্রে শিষ্যদের কী করা উচিত?

তিনি 'সাধনা' ব্যাখ্যা করে বলেন : 'সাধনা হল ভগবানের কাছে পৌঁছবার জ্ঞানের দ্বার, বর্তমান জ্ঞানকে মানসিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে রূপান্তরিত করার উপায়। এই যোগে, সমস্ত রকম জ্ঞান ও কর্মপ্রচেষ্টাকে ভগবানের কাছে অর্পণ করে দিতে হয়। পৃথিবীর রূপান্তর ঘটানোর জন্য তিনি এগুলি ব্যবহার করবেন।' অন্য এক জায়গায় বলেছেন, "এই অবস্থায় প্রবেশ করার জন্য মন নিশ্চল রেখে, জ্ঞানকে মুক্ত করে দিতে হয়। সেখান থেকেই কাজ করা হয়। সেই ক্ষেত্রে স্বর্গীয় জ্ঞান বিভিন্ন স্তরে কী রকমভাবে কাজ করে সেই অভিজ্ঞতা এবং অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জ্ঞানের আলোকের জন্য একটা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা প্রয়োজন। এইটেই একমাত্র [illegible]। অবশিষ্ট অন্য-সব কেবল কথার কথা। নিষ্ফল মানসিক যুক্তি।"

তিনি তাঁর শিষ্যদের সাহিত্যিক ও অন্যান্য কর্মপ্রচেষ্টাতেও সাহায্য করেছেন। তাঁর শক্তির চাপে তাদের প্রচ্ছন্ন গুণগুলি বেড়ে ওঠে। তাঁরা প্রায় যেন দৈবের নির্দেশে নাট্যকার, কবি, চিত্রকর ইত্যাদি হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। একটি চিঠিতে তিনি এই পদ্ধতিটির ব্যাখ্যা করেছেন : "হ্যাঁ, আমি 'জে'-কে সাহায্য করছি। কেউ যখন বাস্তবিকপক্ষে সাহিত্যিক শক্তি বাড়াতে চায়, তখন তাকে সাহায্য করার জন্য আমি কিছুটা শক্তি প্রয়োগ করি। তার মধ্যে যদি প্রচ্ছন্নভাবে কোনো গুণ থেকে থাকে তা হলে তা যত অল্পই হোক, এই শক্তির চাপে তা বাড়বেই এবং তা কখনো এদিকে বা ওদিকে ফেরানো যাবে না। তবে এ কথাও ঠিক যে কোনো কোনো আধার অন্যগুলির থেকে বেশি অনুকূল এবং তারা অনেক তাড়াতাড়ি

ঠিক পথে বাড়ে। যাদের ধারণ করার উপযুক্ত শক্তি নেই তারা পেছিয়ে পড়ে, শেষে বিফল হয়। তবে মোটামুটিভাবে বলতে গেলে, গ্রহীতার দিক থেকে যদি সহযোগিতা পাওয়া যায় তা হলে এই গুণের বিকাশ ঘটানো অপেক্ষাকৃত সহজ। মানুষের মনে যে অপ্রবৃত্তি ও অপ্রকাশের তামস রয়েছে সেগুলিকে শুধু জয় করতে হয়। কিন্তু মনের উন্নতি বা বিকাশের পথে যখন মনের মধ্য থেকেই প্রতিরোধ বা অসহ-যোগিতা আসে তখন সেই বাধাগুলিকে অতিক্রম করা খুব কঠিন হয়ে ওঠে।"

লেখা এবং প্রকৃতপক্ষে বলতে গেলে যে-কোনো কাজ যে যোগাভ্যাসে পরিণত হতে পারে তা ব্যাখ্যা ক'রে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর একজন শিষ্যকে লেখেন: "স্বর্গীয় অনুভূতি থেকে ভগবানের জন্য লেখাই যদি তোমার লক্ষ্য হয় তা হলে হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ থেকে ভগবানের নির্দেশ ও প্রেরণা অনুযায়ী তারই নিখুঁত অনুলিপি তৈরি করো। কবিতা, কলাশিল্প এবং সংগীত থেকে শুরু করে, ছুতারগিরি বা রুটি তৈরি করার কাজ, এমন-কি, ঘর ঝাঁট দেওয়ার কাজ অর্থাৎ সমস্ত কাজই কেবল বাইরের দিক থেকে অতি নিখুঁতভাবে ভগবানকে উদ্দেশ করে করলে, একমাত্র সেই ক্ষেত্রেই তা ভগবানের উদ্দেশ্যে অঞ্জলি দেওয়ার উপযুক্ত হয়।"

শ্রীঅরবিন্দের যোগের কাজটা হল সাধনার অত্যাবশ্যক একটা অঙ্গ। একবার তিনি বলেছিলেন: "যারা আন্তরিক-ভাবে মা'র জন্য কাজ করে, তারা ধ্যানে না বসে বা বিশেষ কোনো পদ্ধতিতে যোগাভ্যাস না করেও, তাদের কাজের জন্য সঠিক জ্ঞান উপলব্ধি করার যোগ্যতা অর্জন করে।"

যাঁরা শান্তি ও সমতার মধ্যে জীবন যাপন করেন কিন্তু তার জন্য কোনো কাজ করেন না অথবা সামান্য কাজ করেন তাঁরা রূপান্তরিত হতে পারবেন কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীঅরবিন্দ পরিষ্কারভাবে বলেন, "না তারা কিছুতেই পাবে না।"

শিষ্য কী করবে বা কী হবে সে সম্পর্কে গুরুর নিজেরই আদর্শ স্থাপন করা উচিত। শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কে মা একটি চিত্তাকর্ষক ঘটনার কথা বলেছেন : "আসল কথা হ'ল, কোনো রকম ভয় না পেয়ে প্রকৃত জ্ঞানকে নিজের দেহের মধ্যে ধরে রাখতে হয় এবং স্বর্গীয় শান্তিতে পরিপূর্ণ হতে হয়। তখন আর কোনো ভয় থাকে না। তখন যে কেবল মানুষের আক্রমণকে প্রতিরোধ করা যায় তাই নয়, পশুপক্ষী, এমন-কি, পঞ্চভূতের আক্রমণও প্রতিহত করা যায়। আমি তোমাদের ছোটো একটি দৃষ্টান্ত দিতে পারি। সেদিন রাত্রির ভীষণ ঝড়ের কথা তোমাদের মনে আছে নিশ্চয়ই। সমগ্র আশ্রমে বৃষ্টি আর ঝড়ের তাণ্ডব। আমি ভাবলাম শ্রীঅরবিন্দের কক্ষে গিয়ে, জানালা দরজাগুলি বন্ধ করে দিয়ে আসি। আমি দরজা খুলেই দেখি তিনি খুব শান্তভাবে বসে লিখছেন। ঘরের মধ্যে এত পূর্ণ শান্তি যে, বাইরে যে ঝড়ের বিপুল তাণ্ডব চলছে তা সেখানে বসে কল্পনাই করা যায় না। সবগুলি জানালা পুরোপুরি খোলা এবং এক ফোঁটা বৃষ্টির জল ঘরে ঢুকছে না।"

অন্তরের এবং বাইরের নানারকম সমস্যা নিয়ে, যেগুলির কোনো সমাধান নেই বলে মনে হয়েছে অথবা অত্যন্ত জটিল সেই ধরনের নানা প্রশ্ন ক'রে, শ্রীঅরবিন্দের কাছে হাজার হাজার চিঠি আসত। তিনি আত্মিক শক্তি দিয়ে এবং চিঠি

দিয়ে, উভয় দিক দিয়ে সেগুলির উত্তর দিতেন। প্রত্যেকটি উত্তরের সঙ্গে থাকত সাহায্য ও রূপান্তরের জন্য একটা শক্তি। কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে :

একজন শিষ্য তার কাজে ক্লান্তি ও কষ্ট অনুভব করছিলেন বলে তাঁকে লেখেন : "যখন কাজ করবে তখনই শুধু কাজের কথা ভাববে, তার আগে বা পরে নয়। যে কাজ শেষ হয়ে গেছে সেখানে তোমার মনকে ফিরে যেতে দিয়ো না। যেটা অতীতের জিনিস সেটা নিয়ে আবার ভাবনা-চিন্তা করা শক্তির অপচয় মাত্র। যে কাজ করতে হবে তার ভাবনা নিয়ে মনকে ভারাক্রান্ত করে তুলো না। তোমার মধ্যে যে শক্তি কাজ করেছে, সেই শক্তিই যথাসময়ে তা দেখে নেবে।

"মনের এই অভ্যাস দুটি অতীতের জিনিস, রূপান্তরকারী-শক্তি এই অভ্যাস দূর করার চেষ্টা করছে কিন্তু জড় বুদ্ধি তার পূর্ব অভ্যাসে থাকতে চাইছে বলে তোমার এই ক্লান্তি ও কষ্ট। মনের যখন কাজ করার প্রয়োজন তখনই শুধু তাকে যদি কাজ করতে দাও তা হলে এই ক্লান্তি আস্তে আস্তে কমে একেবারে চলে যাবে। জড় মনকে অতিমানসিক শক্তি তার অধিকারে নিয়ে এসে তার স্বতঃস্ফূর্ত আলোকে উদ্‌ভাসিত করার পূর্ব পর্যন্ত প্রকৃতপক্ষে মনের স্থিরাবস্থা।"

আর-একজন শিষ্য তাঁর নিজের মধ্যে ভুল থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় শ্রীঅরবিন্দের কাছে জানতে চান। শ্রীঅরবিন্দ উত্তর দেন : "তোমার অসুবিধে এবং নিজের কতকগুলি ভুল ধারণা সম্পর্কে আমার মনে হয় তুমি খুব সম্ভবত সেগুলি নিয়ে খুব বেশি চিন্তা করছ। ওগুলোকে নিজের স্বভাবের অংশ বলে ভুল করছ। তোমার বরং ও-সব থেকে সরে

থাকা উচিত, ও-সব থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা উচিত, ওগুলো অপবিত্র প্রকৃতির নিম্নতর জড় মনে করা উচিত। এই শক্তি-গুলি তোমার মধ্যে প্রবেশ করে তোমাকে তাদের আত্ম-প্রকাশের যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করার চেষ্টা করে। নিজেকে এইভাবে পৃথক ও বিছিন্ন করতে পারলে, নিজের অন্তরে, নিজের আত্মায় এমন একটা স্থান আবিষ্কার করতে পারবে যেখানে তুমি অনেক বেশি শান্তিতে বাস করবে। এই মানসিক অলোড়ন, তোমার হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশ করতে বা সেখানে আক্রমণ করতে পারে না। মনে সেই নিভৃত অংশ তোমাকে ঐশী-শক্তির দিকে এবং জ্ঞানের উচ্চতর মার্গের দিকে নিয়ে যেতে চাইবে। নিজের মনের সেই নিভৃত অংশটি খুঁজে বের করো এবং সেখানেই বাস করো; এটা করার সামর্থ্যই হ'ল যোগের প্রকৃত ভিত্তি।"

আর-একজন শিষ্য প্রশ্ন করেন যে বিরোধী শক্তিগুলির প্রকৃত ভূমিকা কী এবং সেগুলিকে কেন সাধকের অসুবিধে সৃষ্টি করতে দেওয়া হয়? শ্রীঅরবিন্দ উত্তর দেন: "বিরোধী শক্তিগুলির একটা নিজস্ব কার্যপদ্ধতি আছে। ব্যক্তির মানসিক অবস্থা, তার কাজ পরীক্ষা করা এবং ভগবানের আবির্ভাব ও তাদের সাফল্যের প্রস্তুতি, এমন-কি, পৃথিবীর প্রস্তুতি পরীক্ষা করা হল তাদের কাজ। এই যাত্রাপথের প্রতিটি পর্যায়ে তারা ভীষণভাবে আক্রমণ করে, সমালোচনা করে, অন্য পরামর্শ দেয়, হতাশার সৃষ্টি করে বা বিদ্রোহে উস্কানি দেয়, অবিশ্বাস এনে দেয় এবং আরো নানারকম বাধার সৃষ্টি করে। তাদের যা কাজ তা তারা অত্যন্ত বাড়িয়ে দেখায়, অতি সামান্যকে বিরাট বড়ো করে তোলে। অতি সামান্য ভুল বা ভুল

পদক্ষেপ হলেই তারা উল্লাসে যেন মত্ত হয়ে পুরো হিমালয়কে যাত্রাপথের বাধা হিসেবে দাঁড় করায়। তবে প্রাচীনকাল থেকেই এই বাধাকে কেবলমাত্র পরীক্ষা হিসেবে ধরা হয় না, আরো শক্তি, আরো সঠিক আত্মজ্ঞান, পবিত্রতা ও উচ্চাশার অধিকতর শক্তি এবং অবিচল বিশ্বাস অর্জন করাতে আমাদের বাধ্য করার জন্যই এই পরীক্ষা।"

তিনি আর-একজনকে সাবধান করে দিয়েছেন যে "মনের নিষ্ক্রিয়তা ভালো, তবে কেবলমাত্র সত্য এবং দৈব শক্তির স্প সম্পর্কেই নিষ্ক্রিয় থাকা উচিত। তুমি যদি প্রকৃতির নি স্তরের প্রভাব ও প্রলোভন সম্পর্কে নিষ্ক্রিয় থাকো তা হলে তুমি অগ্রসর হতে পারবে না অথবা তুমি বিরোধী শক্তির প্রভাবে যোগের প্রকৃত পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবে।"

একজন শিষ্য শান্তি, নীরবতা ও সমর্পণের মনোভাব অর্জন করেছেন কিন্তু কাজের সময়েও মনের এই ভাবগুলি বজায় রাখতে পারছেন না। তিনি শ্রীঅরবিন্দকে তাঁর অসুবিধের কথাগুলি জানালেন। উত্তর এলো : "অবশেষে তুমি সাধনার প্রকৃত ভিত্তি খুঁজে পেয়েছ। জ্ঞান, শক্তি ও আনন্দ আসার পথে শান্তি, নীরবতা ও সমর্পণ হ'ল উপযুক্ত আবহাওয়া। এগুলিকে সম্পূর্ণ হতে দাও। যে মন নীরবতার দান পেয়েছে এগুলি এখনো সেই মনের মধ্যে কেন্দ্রীভূত বলে, কাজের সময় সেগুলির প্রভাব অনুভব করা যায় না। এই জ্ঞান যখন সম্পূর্ণ রূপ নেবে দেহ ও মনকে সমগ্রভাবে নিজের অধিকারে নিয়ে আসবে (তোমার সত্তা এখন কেবলমাত্র নীরবতার স্পর্শ পেয়েছে এর দ্বারা সম্পূর্ণ অধিকৃত হয় নি) তখন এই অপূর্ণতাও দূর হয়ে যাবে।

"তোমার মনে যে এখন শান্ত জ্ঞান এসেছে তা শুধু শান্ত হলেই চলবে না, তাকে ব্যাপক হতে হবে। সর্বত্র তোমার তা অনুভব করতে হবে। তোমাকে এর মধ্যে ডুবে যেতে হবে। এটা শান্তিকে কাজের মাধ্যম হতে সাহায্য করবে।

"তোমার জ্ঞান ও উপলব্ধি যত ব্যাপক হবে ওপর থেকে তুমি তত বেশি পাবে। শক্তি তখন তোমার মধ্যে অবতরণ ক'রে আলোক, শক্তি ও শান্তি নিয়ে আসবে। তুমি নিজের মধ্যে যে সীমাবদ্ধতা ও সংকীর্ণতা অনুভব কর সেটা হল জড় মন। ব্যাপকতর চেতনা ও আলোক যদি তোমার প্রকৃতিকে অধিকার করতে পারে তা হলেই শুধু মনের ব্যাপ্তি ঘটে।

"ওপর থেকে তোমার মধ্যে যখন শক্তি নেমে আসবে, তখন তোমার এই বাহ্যিক জড়তা আস্তে আস্তে চলে যাবে।

"শান্ত থাকো, নিজেকে উন্মুক্ত করো। এই শান্তি ও শান্ত-ভাব যাতে বজায় থাকে, উপলব্ধি যাতে আরো ব্যাপক হয় এবং বর্তমানে হৃদয় যে পরিমাণ জ্ঞান ও আলো গ্রহণে সম্ভব সেই পরিমাণ জ্ঞান ও আলো দান করার জন্য স্বর্গীয় শক্তির কাছে প্রার্থনা জানাও।

"বেশি অধীর হবে না কারণ তোমার সত্তায় যে শান্তি ও সমতা এসেছে, অতি অধীরতা তা আবার নষ্ট করে দিতে পারে। শেষ ফলের ওপর বিশ্বাস রাখো এবং শক্তিকে তার কাজ করার সময় দাও।"

একজন শিষ্য কোনো অন্যায় কাজ করে ফেলে তার প্রায়শ্চিত্ত সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দের পরামর্শ চান। নিম্নে উল্লিখিত তাঁর চিঠিতে প্রকৃত প্রায়শ্চিত্তের ব্যাখ্যা করা হয়েছে:

"তুমি যে অন্যায় করে ফেলেছ বলে মনে করছ তার জন্য কী করা যায় তা জানতে চেয়েছ। অন্যায় হয়ে গেছে বলে তুমি যখন স্বীকার করছ তা হলে তার ক্ষতিপূরণ হিসেবে তোমার নিজেকে সম্পূর্ণভাবে স্বর্গীয় সত্য ও স্বর্গীয় প্রেমের আধার করে তুলতে হবে। তার জন্য প্রথমেই নিজেকে সম্পূর্ণভাবে পবিত্র করে নিতে হবে, কোনো রকম আত্মাভিমান না রেখে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ভগবানের জন্য উন্মুক্ত করে দিতে হবে। কোনো ভুলের জন্য আধ্যাত্মিক জীবনে এর চাইতে আর কোনো প্রায়শ্চিত্ত নেই। প্রথম দিকে অন্তরের এই বিকাশ ও পরিবর্তনের বেশি অন্য কোনো ফল চাইতে নেই, তা হলে বিপুল হতাশা আসে। কেউ নিজে যদি মুক্ত হন তা হলে তিনি অন্যকেও মুক্ত করতে পারেন। যোগে অন্তরের জয় থেকেই বাইরের জয়।"

শ্রীঅরবিন্দ যদিও নিজেকে কখনো অন্যের ওপর আরোপ করেন নি তবুও তিনি সর্বক্ষেত্রে পরিচালনা করেছেন। বিবাহ সম্পর্কে একজন শিষ্য তাঁর মতামত জানতে চাইলে তিনি যে চিঠি দেন তাতে তাঁর পথপ্রদর্শনের ভূমিকাটি বেশ বোঝা যায়। "...তোমার লক্ষ্য বা আদর্শের ওপর সব-কিছু নির্ভর করছে। বাহ্যিক আনন্দ উপভোগ করার সাধারণ জীবন যাপনই যদি তোমার আদর্শ হয় তা হলে যেখানে খুশি তোমার সঙ্গিনী বেছে নিতে পারো। শিল্পকলা, সংগীত অথবা দেশের সেবা করাই যদি তোমার আদর্শ হয় তা হলে শুধু কামনার ভিত্তিতেই জীবনসঙ্গিনী বেছে নেওয়া উচিত নয়, এর চাইতে উচ্চতর মানের অর্থাৎ তোমার আদর্শের সঙ্গে যে নারীর মিল আছে, তোমার আদর্শ রূপায়িত করতে যে নারী

আন্তরিকভাবে যোগ দিতে পারবে সেই রকম সঙ্গিনী পছন্দ করা উচিত। আধ্যাত্মিক জীবন যদি তোমার আদর্শ হয় তা হলে বিয়ে করার আগে পঞ্চাশবার ভাববে... এই-সব দিক বিবেচনা করে তোমার নিজেরই নিজের কর্তব্য স্থির করা উচিত।"

শিষ্যরা যত সাধনায় অগ্রসর হতে থাকলেন, তাঁদের প্রকৃতির কয়েকটা অংশের যে উন্নতি হচ্ছে না তা ক্রমশ বুঝতে থাকলেন। এঁরা নানা দেশ থেকে আসতেন। তাঁরা নানা ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন, কাজেই স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যেকে কতকগুলি বিশেষ স্বভাব নিয়ে আসতেন। প্রত্যেকের নিজস্ব গুণ ও অসুবিধে ছিল। প্রত্যেককে ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধান করতে হত। একজন শিষ্য তাঁর কামনা জয় করার উদ্দেশ্যে উপবাস করতে শুরু করেন কিন্তু তাতে বিফল হন। সমস্যাটি শ্রীঅরবিন্দের কাছে উল্লেখ করা হয়। উত্তর এল: "সমস্ত সাধারণ মৌলিক গতি প্রকৃত সত্তার কাছে বাহ্য, এগুলি বাইরে থেকে আসে: এগুলি আত্মার জিনিস নয়, এগুলির উৎপত্তিও সেখানে নয়। এগুলি সাধারণ প্রকৃতির তরঙ্গ মাত্র।

"কামনাগুলি বাইরে থেকে এসে অবচেতন মনে প্রবেশ করে, তারপর ওপরে ভেসে ওঠে। ওগুলি যখন ওপরে ভেসে ওঠে এবং মন সেগুলি জানতে পারে তখনই আমরা কামনাগুলি জানতে পারি। সত্তা থেকে এগুলি মনের মধ্যে আসে বলে আমরা মনে করি এগুলি আমাদেরই কামনা কিন্তু এগুলি যে বাইরে থেকে এসেছে তা বুঝতে পারি না। সত্তার মধ্যে যে কামনা-বাসনাই থাকুক-না-কেন তাতে কিছু আসে-

যায় না কিন্তু বিশ্বপ্রকৃতি থেকে যে-সব কামনা-বাসনার তরঙ্গ আসে তাতে সাড়া দেওয়ার অভ্যাস, এগুলিকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য দায়ী।"

একজন শিষ্য তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, "আপনি 'ক'কে পড়া সম্পর্কে যা লিখেছেন তা আমি দেখেছি। এই পরামর্শ আমার পক্ষেও প্রযোজ্য কিনা তাই আমি ভাবছি।" উত্তরে শ্রীঅরবিন্দ বলেন, " 'ক'কে যে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে তা তোমার পক্ষে প্রযোজ্য নয়। সে জ্ঞানের একটি গতিতে প্রবেশ করেছে সেখানে পড়ার কোনো প্রয়োজন নেই। পড়াটা বরং তার জ্ঞানের পথে বাধার সৃষ্টি করতে পারে। তোমার ধ্যানের পথে যদি কোনো বাধার সৃষ্টি না করে তা হলে পড়ায় কোনো আপত্তি নেই।"

ঐ শিষ্যটিই আবারও তাঁর কাছে লেখেন: "বাংলায় কবিতা, গল্প ইত্যাদি রচনায় আমার এমন ভীষণ একটা প্রেরণা আছে…!" এর উত্তরে শ্রীঅরবিন্দ লেখেন: "এই ধরনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা এত অস্পষ্ট যে সাফল্য লাভ করার সম্ভাবনা খুব কম। তোমার আকাঙ্ক্ষার ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ করতে হবে এবং সাফল্যের জন্য তাতে গভীরভাবে মনঃসংযোগ করতে হবে। আমি নিজে বৈজ্ঞানিক, চিত্রকর বা সেনাপতি হওয়ার জন্য চেষ্টা করি না। আমার কতকগুলি জিনিস করার ছিল, ভগবান যতদিন চেয়েছেন ততদিন সেগুলি করেছি; অন্যগুলি যোগের শক্তিতে ওপর থেকে বা ভেতর থেকে আমার মধ্যে উদ্ভাসিত হয়েছে। ভগবান যতটুকু চেয়েছেন আমি ঠিক ততটুকুই করেছি। 'ক'র সক্রিয়তা ছিল এবং যতদিন পর্যন্ত সেই সক্রিয়তা ছিল ততদিন সেই অনুযায়ী চলেছে। তুমি কেবল

চিন্তা কর, চিন্তা কর, আলোচনার পর আলোচনা কর, কেবল ইতস্ততঃ কর··· আধ্যাত্মিকতা ও সৃজনী কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে কোনো অসাম্যতা নেই— এই দুটিকে ঐক্যবদ্ধ করা যায়। ইতস্ততঃ মনোভাব কাজে বাধা আনে এবং সাফল্যেরও বাধাস্বরূপ হয়। এটা বা অন্যটা করা যায় অথবা দুটোই করা যায় কিন্তু চিরকাল ইতস্ততঃ করা চলে না।"

রোগ সম্পর্কেও প্রায়ই প্রশ্ন করা হত। একজন শিষ্য জিজ্ঞেস করেন : "রোগের বেলায় কী হবে। যোগ কি সব রকম রোগ সারাতে পারে?" শ্রীঅরবিন্দ উত্তর দেন : "আমি নিশ্চয়ই পারি তবে বিশ্বাস অথবা উদারতা বা দুটোরই বিশেষ প্রয়োজন। ভাগ্য অনুকূল থাকলে মানসিক শক্তি প্রয়োগ করে ক্যানসার রোগও ভালো করা যায়। একজন মহিলার ক্যানসারে অসফল অস্ত্রোপচার করা হয়, চিকিৎসকরা তাঁকে মিথ্যা আশ্বাস দেন যে অস্ত্রোপচার সফল হয়েছে। কিন্তু মানসিক শক্তি প্রয়োগ করে ক্যানসারের সমস্ত উপসর্গ দূর করা হয়। ফলে বহু বছর পর তিনি সম্পূর্ণ অন্য রোগে মারা যান।" এই শিষ্যটি নিজেই একজন চিকিৎসক। তিনি একজন রোগীর ওপর শ্রীঅরবিন্দের শক্তি সফল হতে দেখেন। "আমরা সকলেই বিশ্বাস করি যে আপনি যখনই আমাদের চিঠি পড়েন তখনই আমরা প্রয়োজনীয় সাহায্য পাই। গতকাল আমি যখন 'র'র চোখের চিকিৎসা করতে গেলাম, তখন তিনি বললেন যে তিনি তাঁর নিজের ভেতরে আপনার শক্তি অনুভব করছেন এবং আপনি নিশ্চয়ই তখন ওর চিঠি পড়ছিলেন।" শ্রীঅরবিন্দ উত্তরে লেখেন : "অন্তর্লোক কতখানি জাগ্রত তার ওপরেই তা নির্ভর করে·তা নইলে

একটা বাহ্য অবলম্বনের প্রয়োজন হয়। কিছু লোক আছেন যাঁরা আমার চিঠি পড়ার পর শান্তি পান: আবার কিছু লোক আছেন তাঁরা চিঠি লেখার সঙ্গে সঙ্গে অথবা তাঁদের চিঠি আমাদের কাছে পৌঁছবার পর আমাদের তা পড়ার আগেই শান্তি লাভ করেন। অন্যরা কেবলমাত্র মনে মনে সমগ্র ব্যাপারটা আমাদের কাছে উল্লেখ করে শান্তি পান।"

সেই চিকিৎসকই আবার জিজ্ঞেস করেন, "আপনি বলেছেন যে-রোগ শরীরে প্রবেশ করার আগেই তা জানতে পারা যায়, সেই ক্ষেত্রে রোগকে সব সময়েই বাধা দেওয়া যায় এবং সম্পূর্ণ রোগহীন হওয়া যায়।" শ্রীঅরবিন্দ উত্তরে লেখেন: "সমস্ত রোগই সূক্ষ্ম জ্ঞান ও সূক্ষ্ম দেহের স্নায়ুমণ্ডলী বা মূল দৈহিক আবরণের ভেতর দিয়ে দেহে প্রবেশ করে। কারুর যদি সূক্ষ্ম দেহ বা সূক্ষ্ম জ্ঞান সম্পর্কে চেতনা থাকে তা হলে তিনি, রোগ স্থূলদেহে প্রবেশ করার আগেই তাকে বাধা দিতে পারেন। তবে কেউ যখন নিদ্রায় অভিভূত থাকেন সেই সময়ে অথবা অবচেতন মনের ভেতর দিয়ে অথবা অসতর্কতার মুহূর্তে হঠাৎ রোগ দেহে প্রবেশ করতে পারে; তখন আর কিছু করার থাকে না, তখন দেহে সে যে স্থান করে নিয়েছে সেখান থেকে তাকে হটাবার জন্য সংগ্রাম করা ছাড়া উপায় থাকে না। আভ্যন্তরীণ পদ্ধতিতে এই আত্মরক্ষার শক্তি এত বেশি হতে পারে যে দেহ প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণ রোগহীন হয়ে পড়ে এবং অনেক যোগী তাই একেবারে নীরোগ থাকেন। তবুও একে সম্পূর্ণ নীরোগ বলা যায় না। সম্পূর্ণ রোগহীনতা অতিমানসিক পরিবর্তনের সঙ্গেই শুধু

আসতে পারে। সাধারণভাবে অতিমানসিকতার নিম্ন পর্যায়ে বিভিন্ন শক্তির মধ্যে সমতায় বিঘ্ন ঘটে বলে এটা ঘটে; কিন্তু অতিমানসিকতার প্রকৃতির নিয়মই অন্য রকম; অতিমানসিক দেহ স্বয়ংক্রিয়ভাবেই অর্থাৎ জন্মক্ষণ থেকেই নীরোগ হবে।"

শ্রীঅরবিন্দকে বলা হল যে : "আজকাল লোকেরা পূর্বের তুলনায় চিকিৎসক ও ওষুধের ওপর বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে বলে মনে হয়।" তিনি উত্তর দেন : "পূর্বের অপেক্ষাকৃত সংখ্যাল্পতার তুলনায় বর্তমানের সংখ্যাধিক্য নানা রকমের প্রভাব নিয়ে এসেছে। যতদিন পর্যন্ত বিশ্বাস প্রধান বস্তু ছিল এবং সাহায্য হিসেবে অল্পস্বল্প চিকিৎসা করা হত তখন চিকিৎসকের বিশেষ প্রয়োজন হত না। কিন্তু যখন বিশ্বাস চলে গেল, রোগ বাড়তে লাগল এবং চিকিৎসক শুধু প্রয়োজনীয় হয়ে পড়লেন না অত্যাবশ্যক হয়ে পড়লেন। তৃতীয় আর-একটা কারণ হল, সমস্ত রকম সন্দেহ, হীনতা ও প্রতিরোধ নিয়ে, সাধনা, বাহ্যিক অনুষ্ঠানে নেমে এল। এগুলি সব দূর করা এখন আর সম্ভব নয়।"

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর শিষ্যদের আত্ম-পর্যালোচনা করতে উৎসাহ দিতেন। তিনি লিখেছেন : "তোমাদের সজ্ঞান হওয়া উচিত এবং তোমাদের আত্ম-পর্যালোচনা আমাদের জানানো উচিত যাতে আমরা সেই অনুযায়ী কাজ করতে পারি। শত শত দৃষ্টান্তে প্রমাণিত হয়েছে যে অনেকের ক্ষেত্রে, তাদের অসুবিধেগুলি আমাদের কাছে সঠিকভাবে জানানোর পর সব সময় না হলেও সঙ্গে সঙ্গে তাদের অসুবিধে দূর হয়েছে।"

একজন শিষ্য বুঝতে পারছিলেন যে তাঁকে মুক্ত করার জন্য যে শক্তি পাঠানো হয়েছে তার পরাক্রম অত্যন্ত প্রবল, তখন তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য গুরু বললেন, "তোমার এতখানি কষ্ট স্বীকার করতে হ'ল বলে আমরা দুঃখিত। মা যে শক্তি প্রয়োগ করেছিলেন তা তোমাকে দুঃখ দেওয়ার জন্য নয় মুক্ত করার জন্য।"

আর-একজনকে এইরকমভাবে উৎসাহ দেওয়া হয় : "তুমি যে-সব জিনিস দেখো, সেগুলির বেশির ভাগই হ'ল, তোমার ভেতরে যে কাজ চলছে তারই নিদর্শন। উপলব্ধির ওপর কোনো ক্রিয়া না করে এগুলি স্বপ্নের মতো মিলিয়ে যাবে তেমন ভয় করবে না। তোমার উপলব্ধিতে ইতিমধ্যেই পরিবর্তন এসেছে কিন্তু আরো বিপুল যে পরিবর্তন আসছে এটা তারই আরম্ভ মাত্র।"

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর উপদেশ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করে বলেন : কেউ যদি সুযোগ না দেয় তা হলে আমি কখনো কারো ত্রুটি দেখিয়ে দিই না। সাধকের সব সময় সচেতন থাকতে হবে এবং নিজেকে আলোর সামনে রেখে, বিচার করতে হবে এবং গ্রহণ, বর্জন বা পরিবর্তন করতে হবে। কারো কাজে বাধা দিয়ে বক্তৃতা দিয়ে এটা ঠিক, ওটা ভুল বলে দেওয়া আমাদের কাজ নয়। ওটা স্কুল শিক্ষকদের কাজ, আধ্যাত্মিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিতে কাজ হয় না।"

শ্রীঅরবিন্দের যোগাভ্যাসে ব্রহ্মচর্য হ'ল অন্যতম একটি প্রধান বিষয়। যৌনকেন্দ্রের রূপান্তর সম্পর্কে তিনি যে-সব চিঠি লিখেছেন তার সারাংশ এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে : "বাহ্য সিদ্ধির জন্য যৌনকেন্দ্রের রূপান্তর ও তার শক্তি প্রয়োজন।

সমস্ত মানসিক, সাত্ত্বিক ও প্রাকৃতিক শক্তিগুলির দৈহিক ভিত্তি এর ওপরেই প্রতিষ্ঠিত। আলো, সৃষ্টিশক্তি এবং পবিত্র স্বর্গীয় আনন্দের জন্য এতে এক ব্যাপক গতি আনতে হবে। এই কেন্দ্রে কেবলমাত্র অতিমানসিক আলো, শক্তি ও আনন্দ এনে এর পরিবর্তন আনা যায়। এর পরে কী কাজ করতে হবে তা অতিমানসিক সত্য, সৃষ্টিধর্মী ভবিষ্যৎ দৃষ্টি এবং স্বর্গীয় মার ইচ্ছা তা স্থির করে দেবে। দিব্য জ্ঞান এই কাজ করবে, যে তমসা ও অজ্ঞানতা থেকে যৌন কামনা ও উপভোগের বাসনার উৎপত্তি হয় তারা নিষ্ক্রিয় থাকবে। এই জ্ঞানের শক্তি এমন হবে যা সংরক্ষণ করবে এবং বিনা বাধায় জীবনীশক্তিগুলির বাসনাহীন বিকিরণ হবে, শুধু শুধু অপচিত হবে না। দেহ ও সত্তার বাসনাগুলির উচ্চতর পূর্তি অতি-মানসিক জীবনে পাওয়া যাবে এ রকম কল্পনা করবে না। মানুষের প্রকৃতিতে পাশবিক বাসনাগুলিকে গৌরবান্বিত করার আশা অতিমানসিক শক্তির অবতরণের পথে প্রধান বাধা। নিজেদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শ চরিতার্থ করার জন্যই মানুষের মন অতি মানসিক অবস্থাটা চায়। দেহ তার আরাম, আয়েশ ও অভ্যাসগুলির আরো দীর্ঘ উপভোগ চায় আর সত্তা তার নিজের বাসনাগুলি চরিতার্থ করতে চায়। এই যদি অবস্থা হত তা হলে পাশবিক ও মানবিক প্রবৃত্তিগুলি আরো গৌরবান্বিত হত, আরো বাড়ত কিন্তু মানুষ থেকে দেবত্বতে পৌঁছবার অন্তর্বর্তী অবস্থা আসত না।

"প্রাণায়াম বা আসনের মতো দৈহিক ব্যায়াম যৌন বাসনাগুলির মূলোচ্ছেদ করতে পারে এমন কোনো কথা নেই—সাত্ত্বিক শক্তিকে বিপুল পরিমাণে বাড়ালেও যৌনপ্রভাব-

যুক্ত শক্তির অদ্ভুত প্রকাশ অনেক সময় দেখতে পাওয়া যায়। এই শক্তি পার্থিব জীবনের মূল ভিত্তি বলে একে জয় করা খুব কঠিন। তবে একটা কাজ করা যায়, নিজেকে এই-সব কামনা বাসনা থেকে মুক্ত করে নিজের অন্তরের নিভৃত প্রদেশ বের ক'রে সেখানেই বাস করতে হয়। তা হলে এগুলি নিজের কামনা বলে মনে হবে না। এটা হল বাইরের প্রকৃতির অন্তরের পুরুষের ওপর বাহ্যিক আরোপ। তখন তাদের সহজে ত্যাগ করা যায় বা উড়িয়ে দেওয়া যায়।"

নিদ্রা ও স্বপ্ন সম্পর্কে তাঁর উপদেশ হল: "কেউ যদি ব্যাখ্যা করতে শেখেন তা হলে স্বপ্ন থেকে আমাদের প্রকৃতি ও অন্যান্য প্রকৃতির গুহ্য তত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারেন।"

দর্শনের সময় গুরু কী করে ভাব বিনিময় করেন? তা ব্যাখ্যা করে শ্রীঅরবিন্দ মা সম্পর্কে বলেছেন: "মা উভয় দিক দিয়ে দান করেন। চোখ দিয়ে মনকে এবং স্পর্শ দিয়ে দেহকে দান করেন।" ভক্তরা যখন তাঁকে প্রণাম জানাতে আসতেন, মা তাঁদের ফুল দিতেন (প্রায় ৪০০ রকম ফুলে বিশেষ আধ্যাত্মিকতার নিদর্শন আছে বলে তিনি উল্লেখ করেছেন।) মা যে ফুল বিতরণ করেন তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, "ফুলের যে বিশেষ তাৎপর্য আছে তা যাতে লাভ করা যায়, তাতে সাহায্য করার জন্যই ফুল দেওয়া হয়।"

শিষ্যদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কী সেই প্রসঙ্গে মা বলেছেন: তোমাদের ও আমাদের মধ্যে, যাঁরা শ্রীঅরবিন্দের এবং আমার শিক্ষার শরণ নিয়েছেন তাঁদের সকলের মধ্যে একটা বিশেষ ব্যক্তিগত বন্ধন রয়েছে, এখানে দূরত্বের কোনো প্রশ্ন
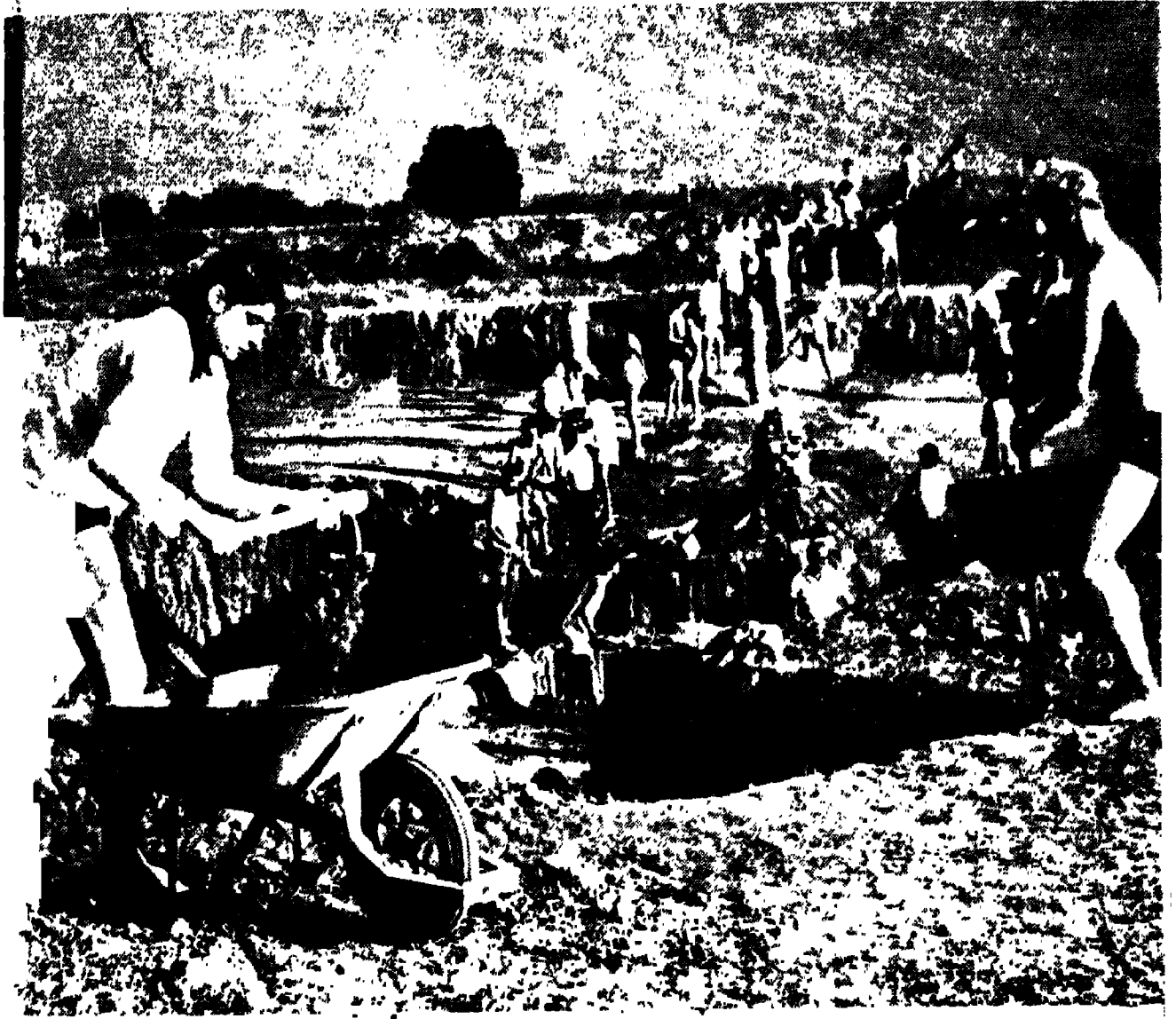
অরোভিলে মাতৃমন্দিরের নির্মাণ-কার্যে যুবক শিষ্যেরা

1968 খৃঃ অঃ আ
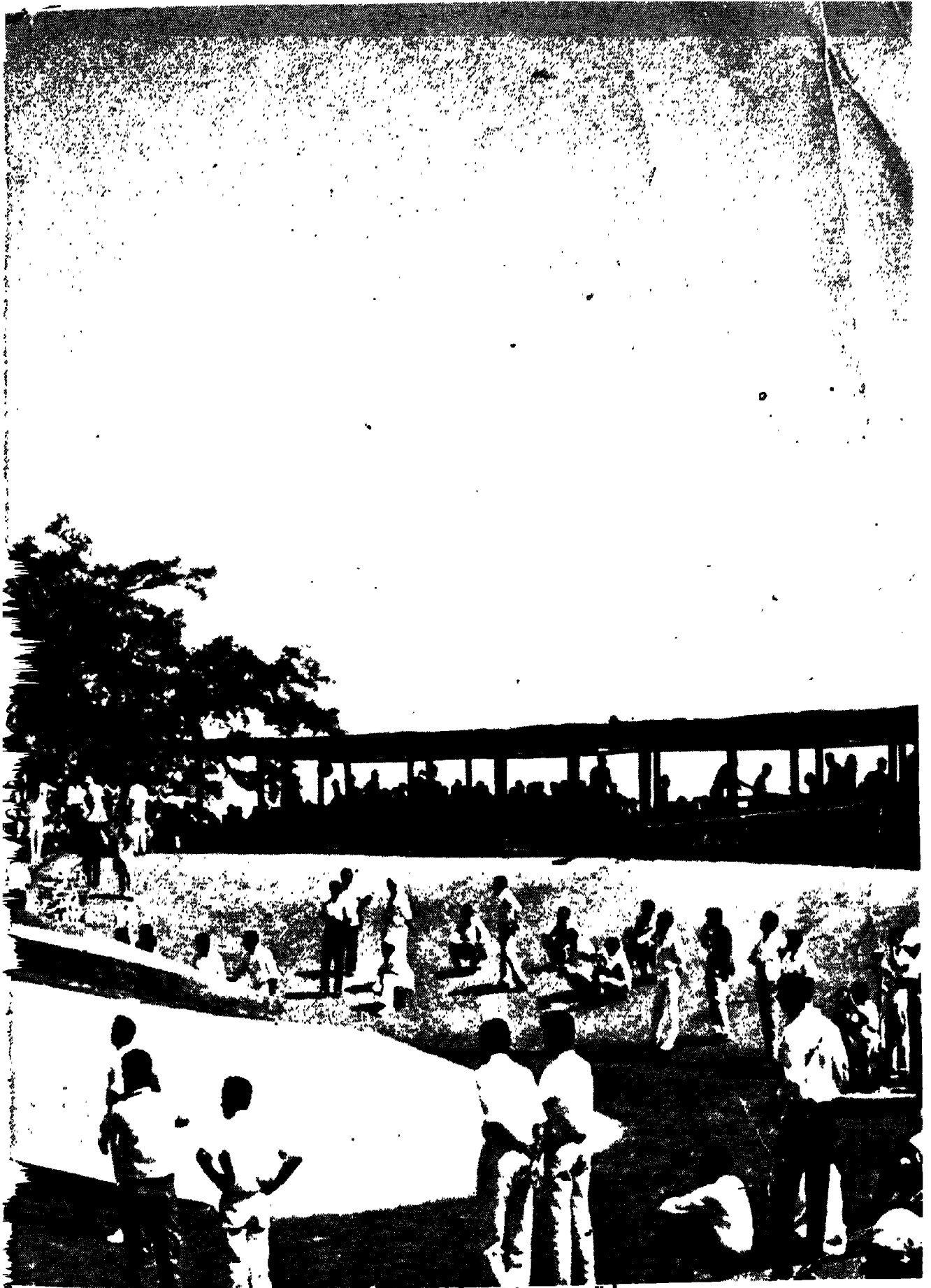
...লের পত্তন-অনুষ্ঠান
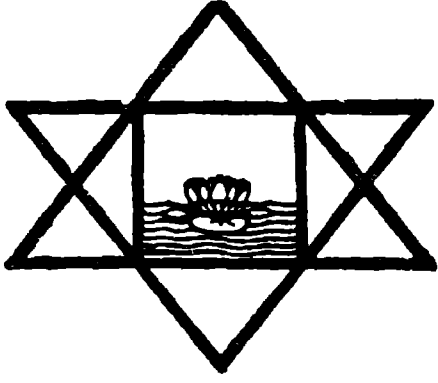
শ্রীঅরবিন্দের প্রতীক-চিহ্ন
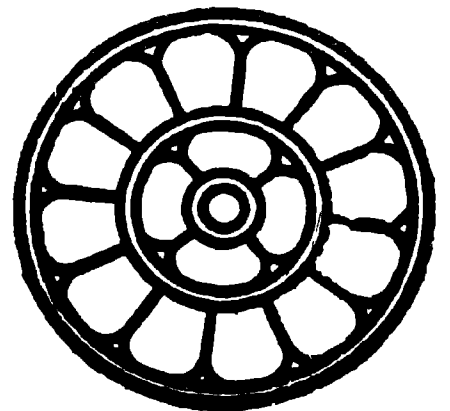
শ্রীমা'র প্রতীক-চিহ্ন

ওঠে না ; তোমরা ফ্রান্সে থাকতে পারো, বিশ্বের অপর সীমায় বা পণ্ডিচেরীতে থাকতে পারো কিন্তু এই বন্ধন সব সময়েই সত্য ও জীবন্ত। যাঁদের আমি শিষ্য বলে গ্রহণ করেছি, যাঁদের আমি "হ্যাঁ" বলেছি, তাঁদের সঙ্গে আমার বন্ধনের চাইতেও বড়ো সম্পর্ক, তাঁদের মধ্যে আমিই রয়েছি। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেকের জন্য, এমন-কি, জীবনে যাঁদের সঙ্গে মাত্র এক সেকেণ্ডের জন্যও দেখা হয়েছে তাদের জন্যও আমি নিজেকে দায়ী মনে করি।"

আর-একটি প্রসঙ্গে বলেন : "কতকগুলি তরঙ্গকে কী করে নিয়ন্ত্রণ করতে হয় তা জানাটাই হল প্রকৃত জ্ঞান। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায় যে কোনো গতি বা তরঙ্গের ওপর যদি প্রভুত্ব করতে হয়, তা হলে কোনো কথা না বলে, কোনো ব্যাখ্যা না দিয়ে একমাত্র নিজের উপস্থিতি দিয়ে অশুভ তরঙ্গের পরিবর্তে শুভ তরঙ্গ সৃষ্টি করা যায়। কথা ব'লে, ব্যাখ্যা ও আলোচনা ক'রে, এমন-কি, খানিকটা আধ্যাত্মিক শক্তি প্রয়োগ ক'রে তুমি অন্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারো কিন্তু তরঙ্গের ওপর প্রভুত্ব করতে পারো না। কোনো তরঙ্গের ওপর প্রভুত্ব করার অর্থ হল, তার চাইতেও বেশি শক্তিশালী ও অধিকতর সত্য তরঙ্গ প্রয়োগ ক'রে অন্য তরঙ্গটিকে প্রতিরোধ করা।

"কোনো একটা জিনিস বোঝাতে যদি কথার প্রয়োজন হয় তা হলে বুঝতে হবে তোমার প্রকৃত জ্ঞান নেই। তোমাদের বোঝানোর জন্য আমি যা বলতে চাই তা যদি সবই বলতে হয় তা হলে বুঝতে হবে যে আমি প্রকৃত গুরু নই, আমি তোমাদের বুদ্ধির ওপর শুধু একটা প্রভাব খাটাই, তোমাদের বুঝতে সাহায্য করি, তোমাদের মধ্যে জানার বাসনাকে

জাগাই, নৈতিক শিক্ষা দেই ইত্যাদি। কোনো কথা না ব'লে, শুধুমাত্র তোমার দিকে দৃষ্টিপাত করে আমি যদি তোমাকে সেই আলোর মধ্যে নিয়ে যেতে না পারি যা তোমাকে বুঝিয়ে দেবে, তা হলে সেই ক্ষেত্রে বুঝতে হবে যে আমি অজ্ঞানতার অবস্থা জয় করতে পারি নি।"

শ্রীঅরবিন্দের রচনা-সমূহ

শ্রীঅরবিন্দের সমস্ত রচনাতেই তিনটি অভিন্ন বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যায় ; ইংরেজী ভাষার ওপর বিরাট দখল ; ১৯০৮ খৃস্টাব্দের পর থেকে নীরব মনের মাধ্যমে প্রেরণা এবং প্রত্যেক বিষয়ে তাঁর সম্যক বা আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি। বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে বলতে গেলে বলা যায় যে, একজন যোগী যে-কোনো বিষয়ে যখন খুশি লিখতে পারেন তাঁর এই কথাটি তিনি প্রমাণ করেছেন। রাজনৈতিক বা আধ্যাত্মিক বিষয়ে, গদ্যে বা পদ্যে রচিত তাঁর লেখাগুলি সব সময়েই প্রেরণাদায়ক।

শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন যে "যে যোগী লেখেন তাঁকে যে সাহিত্যিক বা পণ্ডিত হতে হবে তার কোনো কথা নেই। হৃদয়ের গভীর থেকে যে ইচ্ছা বা কথা প্রকাশিত হতে চায় তাই তিনি প্রকাশ করেন" তাঁর সমস্ত রচনা সম্পর্কেই এই কথা খাটে। গুরু নিজেই বলেছেন, "যোগে সব-কিছুই সম্ভবপর। আমাকে অনেকে দার্শনিক বলেন, কিন্তু আমি কখনো দর্শনশাস্ত্র পড়ি নি। যা-কিছু আমি লিখেছি তা যোগের অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও প্রেরণা থেকেই লিখেছি। পদ্যের ওপর যে বিপুল শক্তি এবং নিখুঁতভাবে ভাব প্রকাশের যে শক্তি আমি সম্প্রতি অর্জন করেছি, তা পড়ে বা অন্যে কি রকমভাবে লেখে তা দেখে অর্জন করি নি, আমার জ্ঞান ও উপলব্ধিকে উচ্চস্তরে নিয়ে সেখান থেকেই প্রেরণা লাভ করেছি।"

শ্রীঅরবিন্দের প্রথম দিকের রাজনৈতিক রচনা ও ভাষণগুলি হল : ১৮৯৩ খৃস্টাব্দে 'ইন্দুপ্রকাশে' প্রকাশিত

"পুরানোর পরিবর্তে নতুন আলো"; "ভবানী মন্দির" পরিকল্পনা; ১৯০৬ থেকে ১৯০৮ খৃস্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত 'বন্দেমাতরমে' প্রায় ১০০টি সম্পাদকীয়; ১৯০৯ থেকে ১৯১০ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত 'ধর্ম' ও 'কর্মযোগী'তে তাঁর রচনাসমূহ; উত্তরপাড়া এবং অন্যান্য বক্তৃতা এবং পণ্ডিচেরীতে আসার পর—"মণ্টেগু-চেম্‌সফোর্ড সংস্কার" সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য। এই-সব রচনা ও বক্তৃতার বৈশিষ্ট্য, তিনি সব সময়ই ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্যের ওপরেই জোর দিয়েছেন। তাঁর কাছে স্বরাজ ছিল, আধুনিক পরিস্থিতিতে ভারতের প্রাচীন জীবনের পুনরুজ্জীবন। জাতীয় মহত্ত্বের সত্যযুগের পুনরাবৃত্তি, গুরু ও পথপ্রদর্শক হিসেবে ভারতের মহান ভূমিকার পুনরভিনয়; রাজনীতিতে বৈদান্তিক আদর্শের পূর্ণ পরিণতির জন্য জনগণের আত্মমুক্তি— এই হ'ল ভারতের জন্য প্রকৃত স্বরাজ। ...নিজের জীবনের ব্যবস্থা নিজের হাতে না নিয়ে ভারত তা সফল করতে পারে না। কোনো কোন বিদেশী সাম্রাজ্যের অধীন বা অংশ না হয়ে তাকে স্বাধীনভাবে নিজস্ব পদ্ধতিতে জীবন যাপন করতে হবে।" স্বাধীনতার জন্য কোন্ পদ্ধতিতে সংগ্রাম পরিচালনা করতে হবে সে সম্পর্কে তিনি পরিষ্কার ইঙ্গিত দিয়ে দেন— একদিকে হ'ল নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ, বর্জন, অসহযোগ, পল্লীসংস্কার এবং 'জাতীয় শিক্ষা, অন্য দিকে প্রয়োজন সশস্ত্র বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুতি। ভারতের মহান অতীত এবং মহত্তর ভবিষ্যতের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস তার প্রথমদিকের রচনাগুলিতে প্রতিভাত হয়।

তাঁর রচনাসমূহে যে চিন্তাধারা প্রকাশিত হয়েছে সেগুলি

১৯০৬ খৃস্টাব্দে যেমন সত্য ছিল এখনো তেমনি সত্য। ১৯০৮ খৃস্টাব্দের ২৮ মার্চ তিনি লেখেন: "আমরা হিন্দু এবং মানসিকতায় আমরা স্বভাবতঃই অধ্যাত্মবাদী, কারণ মানবতার জন্য আমাদের যে কাজ করতে হয় সেই কাজ অন্য কোনো জাতির পক্ষে করা সম্ভব নয়, তা হল জাতিকে অধ্যাত্মশক্তিতে শক্তিশালী করে তোলা....।" ১৯০৮ খৃস্টাব্দের ২৪ এপ্রিল 'বন্দেমাতরমে'র একটি সম্পাদকীয়তে রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি প্রসঙ্গে বলেন: "ভারতের নূতন ও পুরাতন রাজনৈতিক চিন্তাধারার মধ্যে দুটি প্রধান পার্থক্য— প্রথমটি প্রচণ্ড বাস্তবধর্মী ও দ্বিতীয়টি অধ্যাত্মধর্মী।"

আধ্যাত্মিক দর্শন সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দের প্রধান রচনাগুলি 'আর্য' ও অন্যান্য পত্রিকায় যোগ, সংস্কৃতি, বেদ, গীতা ও অন্যান্য বিষয়গুলি প্রথমে ধারাবাহিক ভাবে এবং পরে সংশোধিত আকারে পৃথক পৃথক পুস্তক হিসেবে প্রকাশিত হয়। তাঁর রচনাসমূহে যেন বাস্তবতার আলো দেখতে পাওয়া যায়। আত্মিক অভিজ্ঞতা এবং উপলব্ধি ও বিজ্ঞানের নীতিগুলি একীভূত হয়েছে বলে তাঁর রচনা একদিকে যেমন যুক্তিবহ অন্যদিকে এই রচনাগুলি তাঁর অধ্যয়ন এবং ধ্যানের ফল। এই রচনাগুলিতে শুধু অস্তিত্বের জটিলতম সমস্যাগুলির সম্যক দৃষ্টিভঙ্গি এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাসই প্রতিফলিত হয় নি, আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট উপদেশ দেওয়া হয়েছে, আধ্যাত্মিক সমাজের বিবর্তন এবং বিভিন্নতার মধ্যে মানবসমাজের ঐক্য স্থাপন সম্পর্কে আস্থা প্রকাশিত হয়েছে।

"মানব জীবনের প্রকৃত নীতি হল দেবত্বের পূর্ণতা অর্জন এবং মানুষের এই পার্থিব অস্তিত্বকে এর প্রতিমূর্তিতে রূপায়িত করাই বিবর্তনের অর্থ।" এইটেই হ'ল শ্রীঅরবিন্দের দর্শনের মূল কথা। তাঁর বৃহত্তম রচনা "দি লাইফ ডিভাইন"এ শ্রীঅরবিন্দ, বেদান্তের পর্যায় থেকে আরম্ভ করেছেন। আত্মা, মন ও জীবন সম্পর্কে এর মতামত, সচ্চিদানন্দ, জ্ঞানের জগৎ, অজ্ঞতা, পুনর্জন্ম ও চৈতন্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। এর তথ্যাদি থেকে তিনি ব্যাপক এক অদ্বৈত প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, পার্থিব অবস্থিতির প্রকৃত ভিত্তি যে আধ্যাত্মিক মন বা অতিমন তার মাধ্যমে আত্মা থেকেই, মন জীবন ও বস্তুর উৎপত্তি হয়েছে। মনকে, অতি-মনে উন্নীত ক'রে মানুষ বিশ্বচৈতন্যের প্রকৃত সত্য এবং প্রকৃত তথ্য ও জীবনের উচ্চতম সূত্রে উপনীত হতে পারে। আত্মাই সচ্চিদানন্দ এবং এর ও বিশ্বের মধ্যে সমাধানের অযোগ্য কোনো বিরোধ নেই। আমরা অজ্ঞানতার চোখ দিয়ে বিশ্বকে দেখি। সেই জায়গায় কেবলমাত্র জ্ঞানের চোখ দিয়ে বিশ্বকে দেখতে হবে। বাহ্যতঃ আমরা যা দেখি তার ওপর ভিত্তি ক'রে আমাদের যে জ্ঞান এবং অখণ্ড জ্ঞানের দিকে যে মন মুখ ফিরিয়ে আছে সেটাই আমাদের অজ্ঞানতা। মনকে অখণ্ড জ্ঞানের দিকে পরিচালিত করা এবং মানবজীবনে আধ্যাত্মিক পথে উন্নতি করার জন্যই পুনর্জন্ম দিয়ে মানুষকে সুযোগ দেওয়া হয়। পাশ্চাত্ত্য জগৎ বিবর্তনকে যে বাহ্যিক আকার দিয়েছে সেই রকমভাবে এই সত্যকে গ্রহণ না ক'রে দার্শনিক সত্য, বস্তুতে জীবন, মন চৈতন্যের ঘাত-প্রতিঘাত ও তার ক্রমোন্নত প্রকাশ হিসেবে বিবর্তনকে গ্রহণ করেছে।

এই বিবর্তনের শীর্ষে রয়েছে আধ্যাত্মিক জীবন এবং স্বর্গীয় জীবন।

বেদ-সম্পর্কিত রচনায় শ্রীঅরবিন্দ, বেদের নিদর্শনগুলির গুহ্য তত্ত্ব উন্মোচন করেছেন এবং বিধি অনুষ্ঠানের দুর্বোধ্যতা দূর করেছেন।

গীতা-সম্পর্কিত তাঁর রচনাসমূহ ভগবদ্গীতার একটি আলোকোজ্জ্বল ব্যাখ্যা। জীবনের সত্যের একটা কঠিন ও বৃহত্তম অংশের চৈতন্যের সত্যকে কর্মে নিযুক্তির কথা এতে বলা হয়েছে এবং কর্মের মাধ্যমে কী করে আমরা চৈতন্যে জন্ম নিতে এবং আধ্যাত্মিক জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারি তার একটা পথ এতে দেখানো হয়েছে। আমাদের বুদ্ধিগ্রাহ্য বস্তুগুলি সম্পর্কে অজ্ঞ ব'লে, কতকগুলি ভুল ধারণার বশবর্তী ব'লে এবং মন, জীবন ও দেহের বাহ্যিক দিকটাই বেশি ভাবি ব'লে আমাদের প্রকৃত আত্মা ও সত্তা আমাদের জ্ঞানের অগোচরে থাকে; কিন্তু মানুষের সক্রিয় আত্মাকে যদি একবার তার এই-সব স্বাভাবিক বৃত্তিগুলি থেকে ফিরিয়ে আনতে পারা যায়, সে যদি একবার দেখতে পায় এবং অন্তরতম বাস্তবতার ওপর পূর্ণ আস্থা স্থাপন করে সেখানেই বাস করতে পারে তা হ'লে সমস্ত বদলে যায়; জীবন এবং স্থিতি অন্য রূপ ধারণ করে, তার কাজ বদলে যায়, জীবনের অর্থ ও রূপের পরিবর্তন ঘটে। আমাদের জীবন তখন প্রকৃতির সৃষ্টি ক্ষুদ্র অহং-সর্বস্ব জীবন থাকে না, তা তখন স্বর্গীয়, অমর ও আধ্যাত্মিক শক্তিতে পূর্ণ এক বিরাট জীবনে পরিণত হয়। আমাদের জ্ঞান তখন সীমাবদ্ধ এবং সংগ্রামশীল থাকে না তা হয় অসীম, স্বর্গীয় এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানে পূর্ণ;

আমাদের বাসনা ও কর্মও তখন এই সীমায় আবদ্ধ ব্যক্তিত্ব ও আত্মাভিমানসর্বস্ব থাকে না, যে সর্বশক্তিমান সোঽহং ও চেতনা মানুষের জীবনের মাধ্যমে অবাধভাবে নিজের বাসনা ও কর্মের প্রকাশ করে যাচ্ছেন তার সঙ্গে মিলিত হয়।

'যোগের সমন্বয়ে' শ্রীঅরবিন্দ, আধ্যাত্মিক অনুশাসনের বিভিন্ন উপায় ও পদ্ধতি এবং মানব আকারেই অভিন্ন স্বর্গীয় জীবনলাভে এগুলি কী ভাবে পথনির্দেশ করতে পারে তা বিস্তারিতভাবে দেখাতে চেষ্টা করেছেন।

'মানব ঐক্যের আদর্শ' পুস্তকে, ঐক্যবদ্ধতার দিকে মানবজাতির বর্তমান মনোভাবের প্রশংসা করতে চেষ্টা করেছেন এবং মানবজাতির মধ্যে প্রকৃত ঐক্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কোন্ কোন্ জিনিসের অভাব রয়েছে তা দেখিয়েছেন।

'মানব চক্র' পুস্তকে (প্রথমে এটি সামাজিক উন্নয়নের মনস্তত্ত্ব নামে প্রকাশিত হয়) ভবিষ্যৎ সমাজ কী করে আধ্যাত্মিক সমাজে পরিণত হতে পারে এবং হবে তা ব্যাখ্যা করেছেন। শ্রীঅরবিন্দের সামাজিক দর্শন তাঁর আধ্যাত্মিক দর্শনেরই একটা অংশ।

শ্রীঅরবিন্দ শিষ্যদের কাছে যে-সব চিঠিপত্র লিখেছেন, সেগুলি তাঁর রচনার একটা প্রধান অংশ। তিনি হাজার হাজার চিঠি পেতেন এবং তাঁর সময়ের একটা বড়ো অংশ এগুলির উত্তর দিতেই অতিবাহিত হত। মানুষের জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রায় প্রত্যেক বিষয়ে এই-সব চিঠি আসত— যেমন ভগবান, প্রকৃতি, মানুষ, মানুষের স্তর ও অংশ, ধ্যান, হঠযোগ, তন্ত্র, নিদ্রা ও স্বপ্ন, মন, স্বাভাবিক বোধ, রোগ, স্বপ্ন, কলাশিল্প, সাহিত্য, সাধনা হিসেবে কাজ, ভবিষ্যৎ গণনা,

ব্রহ্মচর্য, খাদ্য, ভাগ্য, কর্ম, পুনর্জন্ম, সাহিত্যিক সমালোচনা, সংস্কৃতি, বিশ্ব পরিস্থিতি, সামাজিক সমস্যা, কবিতা রচনা সম্পর্কে উপদেশ, অর্থ, অতিমানসিক রূপান্তর ইত্যাদি। "সমগ্র জীবনই যোগ" তাঁর মতে একীভূত দৃষ্টিতে সমষ্টি কর্ম-প্রচেষ্টা অন্তর্ভুক্ত।

'ভারতীয় সংস্কৃতির ভিত্তি' পুস্তকে শ্রীঅরবিন্দ, ভারতের ধর্ম, কলাশিল্প, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, শিক্ষা, সভ্যতা ইত্যাদির পেছনে তার চেতনা ও আত্মার কথা উল্লেখ করে ভারতের সংস্কৃতিতে কী করে তার আত্মা প্রকাশিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা করে শেষে বলেছেন : "আমাদের শুধু আমাদের নিজেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নয়। আমাদের চতুর্দিকে যে আধুনিক বিশ্ব রয়েছে তার থেকে স্বাধীনভাবে জ্ঞান আহরণ করা উচিত। তা না হলে আমরা বাঁচতে পারব না।"

"ভারতের আদর্শ ভারতের ঐতিহ্যের ওপর সজাগ দৃষ্টি রেখে বিশ্বসংস্কৃতির প্রত্যেকটি ক্ষেত্র আমাদের পরীক্ষা করা উচিত এবং বর্তমান পরিস্থিতি ও সম্ভাবনায় এগুলি নতুন কী সৃষ্টি করতে পারে সেদিকে দৃষ্টি রেখে প্রয়োজন অনুযায়ী কাজে লাগানো উচিত।"

"মা", "ভগবানের সময়", "পুনর্জন্মের সমস্যা" ইত্যাদি শ্রীঅরবিন্দের ক্ষুদ্রতর রচনাগুলিতেও বিভিন্ন বিষয় ও সমস্যা সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দের জ্ঞানের আলোক দেখতে পাওয়া যায়। এগুলি পড়লে ভাব প্রকাশের নিখুঁত পরিপূর্ণতা বুঝতে পারা যায়। এগুলি অন্তরের আলো জ্বালিয়ে দেয়, যেন নতুন এক দিগন্ত খুলে দেয় এবং শব্দব্রহ্মের একটা রূপ যেন দেখতে পাওয়া যায়।

'ভবিষ্যতের কবিতা' পুস্তকে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন; "...অতীতে কল্পনার উচ্চতম শিখরে পৌঁছে কবিতা, জগৎ সৃষ্টির পেছনে ভগবানের বাস্তবতা প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু ভবিষ্যতের কবিতার উচ্চতর জ্ঞানের লক্ষ্যের দিকে দৃঢ় প্রচেষ্টায় এগিয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে বলে মনে হচ্ছে। মানুষের আত্মার গভীরতম উক্তি এবং বস্তুতে বিশ্বজনীন চেতনা ভাষায় প্রকাশ করার সমস্যা ভবিষ্যতের কবিতাকে সমাধান করতে হবে। এই স্বপ্ন ও অভিজ্ঞতাকে সুন্দর আকারে প্রকাশশীল ভাষায় ব্যক্ত করার উপায় বের করতে হবে। ভবিষ্যতের কবিতার মূল বস্তু সম্ভবত এমন হবে যা চেতনাকে প্রকাশ করবে না, চেতনাই নিজের আকার ও কথা দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করবে।"

শ্রীঅরবিন্দের পৌরাণিক নিদর্শনমূলক কবিতা 'সাবিত্রী', তাঁর শেষতম ও মহত্তম রচনা। এতে অমিত্রাক্ষর ছন্দে ২৩,৮০০টি লাইন আছে এবং ইংরেজী ভাষায় এটি হ'ল দীর্ঘতম মহাকাব্য। শ্রীঅরবিন্দ এটির বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন: "এটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গী ; প্রকাশের, নতুন এক ভাবযোগের কবিতা..." তিনি বলেছেন, "আমি 'সাবিত্রী'কে ঊর্ধ্বলোকে গমনের উপায় হিসেবে ব্যবহার করেছি। মনের একটা বিশেষ স্তর থেকে আমি এটা লিখতে আরম্ভ করি, কিন্তু যখনই আমি উচ্চতর কোনো স্তরে পৌঁচেছি তখনই আবার সেই স্তর থেকে এটা নতুন করে লিখেছি। তা ছাড়া যদি আমি মনে করতাম যে কোনো কবিতা নিম্নতর স্তর থেকে এসেছে তা হলে সেগুলি ভালো কবিতা হলেও আমি সন্তুষ্ট থাকতাম না। সবগুলি যতদূর সম্ভব একই স্তরের যাতে হয় সেদিকে আমি বিশেষ

সতর্ক থাকতাম। প্রকৃতপক্ষে 'সাবিত্রী'কে আমি এমন ধরনের কবিতা মনে করতাম না যা লিখে শেষ করলেই হয়, যৌগিক জ্ঞান থেকে কী রকম কবিতা লেখা যায় এবং সেগুলি কতদূর সৃষ্টি নীল করা যায় এটা ছিল তারই পরীক্ষার ক্ষেত্র।" আবার বলেছেন, "সাবিত্রী হ'ল এমন একটা অন্তর্দৃষ্টি এবং অভিজ্ঞতার ফল, যা সাধারণ নয়।"

"সাবিত্রী" হল প্রকৃতপক্ষে সমস্ত দর্শন ও মানুষের সমস্ত ধর্মের সর্বোচ্চ জ্ঞান। এটা একটা আধ্যাত্মিক উপায়, যোগ, তপস্যা, সাধনা সব কিছু এখানে একীভূত হয়েছে। 'সাবিত্রী' মহাকাব্যটির শক্তি অসাধারণ— যে গ্রহণ করতে পারে কাব্যটি তাকে জ্ঞানের পথে স্পন্দিত করে তোলে। এটা সত্যের সমুদ্র, শ্রীঅরবিন্দ যে সত্যকে এই পৃথিবীতে নিয়ে আসেন।

শ্রীঅরবিন্দ এই মহাকাব্যে আমাদের জন্য যুগের বাণী প্রকাশ করে গেছেন তবে সেটা আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে এটা ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশ। এটা ধ্যান, সেই অসীম, চিরন্তনের অন্বেষণ যথোচিত প্রত্যাশা নিয়ে এটি যদি পাঠ করা যায় তা হলে এই পঠনই অমরত্বের পথ-নির্দেশক হবে। ভগবানকে লাভ করার জন্য যা প্রয়োজন তা সবই এতে আছে। অন্যান্য যোগসহ যোগের প্রত্যেকটি স্তর এতে পাওয়া যাবে। বলা হয় যে প্রত্যেকটি কবিতায় যা প্রকাশিত হয়েছে কেউ যদি আন্তরিকভাবে তা অনুসরণ করেন তা হলে গুরু ছাড়াই অতিমানসিক যোগের রূপান্তরের পর্যায়ে সুনিশ্চিতভাবে পৌঁছানো যায়। এটি একটি অব্যর্থ পথপ্রদর্শক। ভাবযোগ, জ্যোতির্বিদ্যা, দর্শন, বিবর্তনের ইতিহাস, মানুষের ইতিহাস, দেবতাদের কথা, সৃষ্টি, প্রকৃতি

সব-কিছু এর মধ্যে আছে। বিশ্ব কী করে সৃষ্ট হয়, কী তার উদ্দেশ্য, কী তার শেষ লক্ষ্য সব এতে আছে। সব প্রশ্নের সব উত্তর এতে পাওয়া যাবে। যদি আবিষ্কার করার যোগ্যতা থাকে তা হলে সব বিষয়ের ব্যাখ্যা এতে পাওয়া যাবে : এমন-কি, এখন পর্যন্ত কেউ যা জানেন না তাও এতে রয়েছে। এখানে 'সাবিত্রী' থেকে দুটি উদ্ধৃতি দেওয়া হল :

জাদুদণ্ডের একটি আচম্বিত স্পর্শ যেন
সর্বশক্তিমানের সীমাহীন ইচ্ছার অবগুণ্ঠন সরিয়ে দেয় :
একটি প্রার্থনা, একটি মহৎ কাজ, একটি প্রেমের আদর্শ
যোগ-সাধন করে
মানুষের শক্তির সঙ্গে পরমোত্তমের শক্তির।
তখন অলৌকিকত্ব হয়ে যায় সাধারণ জিনিস,
একটি মহৎ কাজ ঘটনার গতি পরিবর্তিত করতে পারে
নিভৃতের একটি চিন্তা সর্বশক্তিমানের রূপ গ্রহণ করে।

নিত্য অক্ষয় গতি মানসিক রাজ্যে
নিত্যতার পরিপূর্ণতা
নিজেকে বলে কালের গর্ভে জাত পরিপূর্ণতা।
ভগবানের সত্যতা মানবজীবনকে বিস্ময়াভিভূত করে
ভগবানের মূর্তি সসীম আকার ধারণ করে।
সেখানে আছে চিরস্থায়ী আলোর জগৎ।
এখানে সত্য এক দুর্জ্ঞেয় রহস্য জালে
তার মাথা লুকিয়ে রাখে ;
নগ্ন বাস্তবতার অসম্ভব যুক্তি
সত্যের অবগুণ্ঠন মোচন করতে চায়।

সেখানে প্রকৃতি তার অভিন্ন সত্য নিয়ে প্রকাশমান।

সেখানে আছে আত্মার বস্তু দিয়ে তৈরি দেহ
চিরকালের অগ্নির অগ্নিকুণ্ড ;

আত্মার আন্দোলনেই থাকে কার্যের পরিণতি,
চিন্তা অমোঘ ও সার্বভৌম,
এবং জীবন হ'ল
সেই একের কাছে পরমানন্দ উৎসর্গের,
অবিরাম পূজার অনুষ্ঠান।
এক বিশ্বজনীন দৃষ্টি, এক আধ্যাত্মিক অনুভূতি,
সীমার মধ্যে সমগ্র অসীমকে অনুভব করে,
আলোকের একটি কম্পনের মধ্য দিয়ে
অদেহীর উজ্জ্বল মুখমণ্ডল আবিষ্কার করে।
ক্ষণিকের একটি সত্যের মুহূর্তে,
আত্মা ক্ষণিকের জন্য চিরন্তনের
অমৃতমধু পান করতে পারে।

শ্রীঅরবিন্দের, প্রথম দিককার কবিতাবলীর মধ্যে রয়েছে "দি সঙ্গ্‌স্‌ টু মারটিলা"। তিনি যখন ইংল্যাণ্ডে ছিলেন তখন ১৮৯০-৯২ খৃস্টাব্দের মধ্যে এগুলি রচিত হয়। তখন তাঁর বয়স ছিল ১৮ বছর। প্রথম দিককার ২৪টি কবিতার মধ্যে বেশির ভাগই 'কালেক্টেড পোয়েমস্‌ অ্যাণ্ড প্লেজ'এ প্রকাশিত হয়। এগুলির রচনাকাল হ'ল ১৯০৫ থেকে ১৯১০। এগুলির মধ্যে কিছু পণ্ডিচেরীতে রচিত হয়। কোয়ান্টিটেটিভ হেক্সামীটারে রচিত "ইলিয়ন" মহাকাব্যটির বিষয়বস্তু নেওয়া হয়েছে

গ্রীসের ভয়ংকর মানুষ এচিলিস এবং অ্যামাজনের রানী পেন্থিসিলিয়ার যুদ্ধ থেকে।

শ্রীঅরবিন্দ কতকগুলি সংস্কৃত ও বাংলা কাব্য ও নাটক ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। সংস্কৃত ভাষা থেকে তিনি যে-সব কাব্য অনুবাদ করেন সেগুলির মধ্যে প্রধান দুটি হল "বিক্রমোর্বশী" এবং বেদের "অগ্নিপূজা"।

শ্রীঅরবিন্দ যে-সব নাটক রচনা করেছেন সেগুলিও উল্লেখযোগ্য। এগুলির মধ্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত চারটির ঘটনাস্থল চারটি বিভিন্ন দেশ প্রাচীন গ্রীস, সিরিয়া, পারস্য ও ইরাক। আর-একটি "বাসবদত্তা"। এর সংস্কৃত নাম থেকেই বোঝা যায় যে এটির ঘটনাস্থল ভারত, সময় "মহাভারতের যুদ্ধের পর"। এই-সব নাটকে, সব ঘটনার পেছনেই যে ঐশ্বরিক জ্ঞানের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে তা দেখানো হয়েছে এবং এগুলিতে ঐক্য ও অমরতার প্রতি একটা নীরব আকূতি রয়েছে।

সাহিত্য-সমালোচক হিসেবে শ্রীঅরবিন্দ, গ্যেটে, শেক্সপীয়ার, হোমার, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, বাল্মীকি, দান্তে, কালিদাস, এ্যাচিলাস, ভার্জিল, মিল্টন, সোফোক্লিস, ব্যাস ইত্যাদি বিভিন্ন কবি নাট্যকার সম্পর্কে দীপ্ত পর্যালোচনা করেছেন।

শ্রীঅরবিন্দের রচনায়, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, ভগবান এবং সৃষ্টি এক অখণ্ড জ্ঞানের অভিজ্ঞতায় রূপ ও পূর্ণতা পেয়েছে। মানবজাতির কাছে যা সর্বশক্তিমানের বরস্বরূপ।

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম

মা একবার বলেছিলেন, "আমার লক্ষ্য এমন-একটা বড় পরিবার গড়ে তোলা যেখানে প্রত্যেকেই তার ক্ষমতার পূর্ণ বিকাশ লাভ করতে পারবে, সেগুলি প্রকাশের সুযোগ পাবে।"

এই আশ্রমটিতে শ্রীঅরবিন্দ ও মা'র আদর্শগুলি স্বাভাবিক-ভাবেই রূপায়িত হচ্ছে। ১৯১০ সালে শ্রীঅরবিন্দ যখন প্রথম পণ্ডিচেরীতে আসেন, তখন তাঁর সঙ্গে কয়েকজন যুবা রাজনৈতিক সহকর্মীও আসেন, তাঁরা এক পরিবারের লোকের মতো বাস করতেন। যত দিন যেতে লাগল, অন্য অধ্যাত্ম-সন্ধানীরাও এসে তাঁদের সঙ্গে যোগ দিতে লাগলেন। তবে ১৯২০ খৃস্টাব্দে মা যখন স্থায়ীভাবে পণ্ডিচেরীতে বাস করার জন্য এলেন তখন থেকেই সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং সমবেত জীবন আরম্ভ করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে ১৯২৬ খৃস্টাব্দের ২৪ নভেম্বরের পর আশ্রমটি তার প্রকৃত রূপ নিতে থাকে। তখনই অরবিন্দ শিষ্যদের পরিচালনভার মা'র হাতে অর্পণ করেন।

ভারতে আশ্রম বলতে এমন একটি প্রতিষ্ঠানকে বোঝায় যেখানে ধর্ম বা অধ্যাত্ম সন্ধানীরা একজন গুরুর কাছে সমবেত হন। এঁরা সংসার ত্যাগ করে অধ্যাত্মজীবন যাপন করার জন্য এখানে আসেন। শিষ্যরা প্রথমে শ্রীঅরবিন্দের কাছে এবং পরে মা'র কাছে সমবেত হলেও শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের বেলায় এই সূত্র প্রয়োগ করা যায় না। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন :

"সংসার ত্যাগ করার উদ্দেশ্যে এই আশ্রম স্থাপন করা হয় নি বরং অন্য-এক ধরনের, অন্য এক আকারের জীবন গড়ে তুলতে চেষ্টা করার ও পরীক্ষা করার একটি কেন্দ্র হিসেবে এটি স্থাপন করা হয়েছে।"

কোনো আশ্রম স্থাপন করার কোনো রকম চিন্তা করার আগে এবং বাংলাদেশে তাঁকে গ্রেফতার করার পূর্বেই শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন, "যে মানুষ যোগের শক্তি লাভ করেও সাধারণ মানুষের মতো জীবন যাপন করেন, তাঁর মাধ্যমেই আধ্যাত্মিক জীবনের সুষ্ঠু প্রকাশ হয়। আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক জীবনের এই মিলনের মাধ্যমেই শেষ পর্যন্ত মানবজাতি উচ্চস্তরে উঠতে পারবে এবং বিরাট শক্তিশালী ও স্বর্গীয় হয়ে উঠবে।"

কাজেই এই আশ্রমটি হ'ল এমন একটি স্থান যেখানে দৈনন্দিন সাধারণ জীবন আধ্যাত্মিক জীবনেরই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। সমস্ত জাতির, সমস্ত বৃত্তির যে, ১৬০০ সদস্য এই আশ্রমে আছেন তাঁরা সন্ন্যাসী বা সাধু নন তাঁরা হলেন সাধক, সত্যান্বেষী, ভগবান দর্শনাভিলাষী। তাঁদের লক্ষ্য হল পার্থিব অবস্থিতিতে এই পৃথিবীতেই ঐশী জীবন অর্জন। মা তাঁর বিচার অনুযায়ী যার অন্তরে ভগবানের আহ্বান এসেছে বলে মনে করেন তাঁদেরই শুধু আশ্রমে নেওয়া হয়। শ্রীঅরবিন্দ একবার বলেছিলেন: "আমরা ধনী ও দরিদ্র, উচ্চ ও নিম্ন বংশজাত সকলকেই গ্রহণ করি এবং প্রত্যেককেই সমানভাবে ভালোবাসি ও সংরক্ষণ করি।"

১৯২০ খৃস্টাব্দের পর থেকে আশ্রম ক্রমশ বাড়তে থাকে।

মা যেখানে বাস করেন এবং শ্রীঅরবিন্দের সমাধি যেখানে রয়েছে সেই দুটি প্রধান বাড়ি ছাড়াও পণ্ডিচেরী শহর ও শহরতলীতে আশ্রমের অনেক বাড়ি রয়েছে। আশ্রমের প্রান্ত কোন্‌টা এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হলে শ্রীঅরবিন্দ বলেন : "আশ্রমের সাধকগণ যে সব বাড়িতে থাকেন সেগুলির প্রত্যেকটিই আশ্রম প্রান্ত বা সীমার মধ্যে অবস্থিত।"

যাঁরা আশ্রমে প্রথম আসেন বিশেষ করে পাশ্চাত্ত্যের আগন্তুক, তাঁরা আশ্রম দেখে হতাশ হয়ে যান। কোনো কিছু শেখার জন্য কেউ তাঁদের সাহায্য করেন না, কোনো ক্লাস নেই, শ্রীঅরবিন্দ ও মা'র বাণী ছাড়া কোনো লেকচার বা শিক্ষা নেই। অত্যন্ত ব্যস্ত একটা জীবনধারার মধ্যে ভবিষ্যৎ শিষ্যকে নিজেকেই সব খুঁজে নিতে হয়। তাঁকে নিজের ওপরেই নির্ভর করতে হয়। হৃদয়ের আলো ছাড়া তাঁকে রক্ষা করার কোনো প্রাচীর নেই।

আশ্রমটিকে এক বিরাট গবেষণাগার বলে বর্ণনা করা হয়েছে— শ্রীঅরবিন্দও তাই বলতেন। এখানে মন, প্রাণ ও অধ্যাত্ম সম্পর্কে সর্বস্তরের বিবর্তন নিয়ে পরীক্ষা করা হয়। এখানে সর্বস্তরের, সব রকম ধর্মের ও ঐতিহ্যের অধিবাসী আছেন। কোনো সাধক গার্হস্থ্য ধর্মে ছিলেন হিন্দু, কেউ-বা মুসলমান, কেউ খৃস্টান, কেউ-বা তাও-মতবাদী, কেউ-বা বৌদ্ধ ইত্যাদি। সকলেই বিবর্তনের বিভিন্ন স্তরে রয়েছেন। প্রত্যেককেই তাঁর নিজের সত্য খুঁজে নিতে হবে এবং তাঁর সত্য প্রতিবেশীর সঙ্গে না মিলতেও পারে। শ্রীঅরবিন্দের পরামর্শ অন্যরকম হলেও কেউ-বা তপস্যায় বিশ্বাসী এবং তাঁরা নিভৃতে বাস করেন।

বেশির ভাগ সাধকই কাজ করেন। প্রত্যেকের রুচি অনুযায়ী কাজ আছে। আন্তর্জাতিক শিক্ষাকেন্দ্রে আপনি ইচ্ছে করলে শিক্ষকতা করতে পারেন। এখানে কিণ্ডারগার্টেন থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয় ; অথবা আপনি স্টেইনলেস্ স্টীল তৈরির কাজে, হাতে তৈরি কাগজ উৎপাদনে, আসবাবপত্র, সুগন্ধী দ্রব্যাদি, হস্তচালিত তাঁতের কাপড় তৈরি করতে অথবা চাষের আবাদে বা বাগানের কাজে সাহায্য করতে পারেন। যন্ত্রবিদ্যা সম্পর্কে যদি আপনার ঝোঁক থাকে তাহলে তার জন্য রয়েছে মোটরগাড়ি, ট্র্যাক্টর ও ট্রাকের ওয়ার্কশপ। অথবা দর্জির কাজে, রুটি তৈরির কাজে, ছাপার কাজে (বহু ভাষায়), ছুতোরের কাজে অথবা ডেয়ারির কাজে হাত লাগাতে পারেন অথবা আপনি যদি প্রকৃত নির্ঝঞ্ঝাট জীবন চান তা হলে খাবার ঘরে ডিস্ ধোয়ার কাজ করতে পারেন।

এখানে রয়েছে লাইব্রেরি, পাঠাগার, বিরাট খেলাধুলার মাঠ, সাঁতার কাটার বড়ো একটি পুকুর এবং সংগীত, শিল্পকলা ও ফোটোগ্রাফের সুযোগ-সুবিধা।

কোনো কাজকেই অপর কাজ থেকে বড়ো বলে ধরা হয় না। কোনো কাজের জন্যই পয়সা দেওয়া হয় না। জীবন-ধারণের পক্ষে যা-কিছু প্রয়োজনীয় মা সেগুলির ব্যবস্থা করেন। কাজেই সাধকরা আর্থিক সমস্যা থেকে মুক্ত। প্রকৃত কাজ নিজের সত্যানুসন্ধান।

অখণ্ড রূপান্তরের কথা সব সময়ে মনে রেখে, উদার মনে সেবার মনোভাব নিয়ে সমস্ত কাজ করতে হয় এবং তা ভগবানের কাছে সমর্পণ করতে হয়। মা বলেন,

"ভগবানের জন্য কাজ করার অর্থ দেহ দিয়ে প্রার্থনা করা।"

আশ্রমে প্রায় ৮০০ শিশু বাস করে। শ্রীঅরবিন্দ আন্ত-র্জাতিক শিক্ষাকেন্দ্র ১৯৫২ খৃস্টাব্দে স্থাপিত হয় এবং এখানকার শিক্ষাও সাধারণ নয়। মা বলেছেন, "শিক্ষা সম্পূর্ণ হতে হলে মানুষের পাঁচটি প্রধান কাজের পাঁচটি মুখ্য নীতি সম্পর্কে জ্ঞান থাকা দরকার। দেহ, প্রাণ, মন, চৈতন্য এবং অধ্যাত্ম এই পাঁচটি হ'ল প্রধান বিষয়।" তিনি আরও বলেছেন : দেহ, প্রাণ এবং মন শিক্ষার এই তিনটি দিক যাকে বলা যায় মানুষের ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলে···চৈতন্য সম্পর্কিত শিক্ষায়, জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য, পৃথিবীতে আমাদের অস্তিত্বের কারণ, যে লক্ষ্য আবিষ্কারের জন্য জীবন, সেই আবিষ্কারের ফল, চিরন্তন নীতির জন্য উৎসর্গীকরণ ইত্যাদি সমস্যাগুলির সমাধান শেখানো হয়।

কয়েক বছর আগে মা যখন আশ্রম শিশুদের সঙ্গে নিয়মিত দেখাসাক্ষাৎ করতেন তখন একবার তাদের বলেন : "আমার শিশুরা তোমরা সবাই এখানে একেবারে নিজেদের খুশিমতো থাকছ। সামাজিক কোনো বাঁধাবাঁধি নেই, নৈতিক বাধাও কিছু নেই। পড়াশুনাতেও কোনো বাধাবাধি নেই। কোনো নিয়মকানুন নেই— ঐখানের একটা আলো ছাড়া আর কিছু নেই।"

আজকাল মা তাঁর ঘরেই থাকেন। সেখানেই সাধক ও দর্শকদের সঙ্গে দেখা করেন। বছরে মাত্র চারবার বাইরে এসে সাধারণদের দর্শন দেন। কেউ সাক্ষাৎ করতে চাইলে তিনি অবশ্য সাক্ষাৎ করেন। এখন পর্যন্ত আশ্রমের সমস্ত কাজকর্ম

নিয়ন্ত্রণ করেন। তাঁর নিজের কথাতেই বলা যায় : "আশ্রমটি একটি অরণ্যের মতো বড়ো হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে এবং এখানে যা কিছু গড়ে উঠেছে তার জন্য কোনো পরিকল্পনা করা হয় নি, প্রয়োজনের তাগিদেই এগুলি গড়ে উঠেছে।...

"আশ্রমটিকে নতুন বিশ্বের শৈশবের দোলনা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে...

"যাঁরা সেই উদ্দেশ্যে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করতে রাজী তাঁদের জন্য এর দরজা খোলা এবং সব সময়ের জন্যই খোলা থাকবে।"

অরোভিল

শ্রীঅরবিন্দের অখণ্ড যোগের প্রধান লক্ষ্য অতিমানসিক রূপান্তর। ১৯৫৬ খৃস্টাব্দের ২৯ ফেব্রুয়ারি যে অতিমানসিক অবতরণ ঘটে তা প্রথম পদক্ষেপ। আন্তর্জাতিক শহর 'অরোভিল' (শ্রীঅরবিন্দের নামানুসারে) প্রতিষ্ঠা দ্বিতীয় পদক্ষেপ। ১৯৩১ খৃস্টাব্দেই মা ব্যাখ্যা করে বলেন : "একবার সম্পর্ক (অতিমানস ও পার্থিব জীবের সঙ্গে) স্থাপিত হলে, আদর্শ শহর স্থাপন থেকে শুরু করে এক পরিপূর্ণ বিশ্ব সৃষ্টি পর্যন্ত নতুন সৃষ্টির আকারে বাইরের জগতে এর ফল দেখতে পাওয়া যাবে।"

শ্রীঅরবিন্দের আদর্শগুলির জীবন্ত রূপায়ন হিসেবে কল্পিত অরোভিলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয় ১৯৬৮ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি। এই উপলক্ষে মা বলেন : "শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সব মানুষের কাছে অরোভিল থেকে অভিনন্দন জানানো হচ্ছে। যাঁরা অগ্রগতি করতে চান এবং উচ্চতর ও সত্যতর জীবন অর্জনে অভিলাষী তাঁদের অরোভিলে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।"

অরোভিলের সনদ এই রকম :

"অরোভিল বিশেষ কারো সম্পত্তি নয়। অরোভিলের মালিক সমগ্রভাবে মানবজাতি। কিন্তু অরোভিলে বাস করতে হলে তাঁকে ঐশী জ্ঞানের বিনীত সেবক হতে হবে।"

"অরোভিল হবে অশেষ জ্ঞানের, অবিরাম অগ্রগতির এবং যে যৌবনে কখনো বার্ধক্য আসে না তার স্থান।"

"অরোভিল অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজ করতে চায়। বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ সমস্ত আবিষ্কারের

সুযোগ নিয়ে অরোভিল নির্ভীকভাবে ভবিষ্যৎ উপলব্ধির দিকে এগিয়ে যাবে।"

"প্রকৃত মানব ঐক্যের একটি জীবন্ত রূপের জন্য অরোভিল হবে পার্থিব ও আধ্যাত্মিক গবেষণার একটি কেন্দ্র।"

মা বলেন, "অরোভিল হবে একটি বিশ্বজনীন শহর, যেখানে সমস্ত দেশের স্ত্রী ও পুরুষের সব রকম ধর্মমত রাজনীতি এবং জাতিনির্বিশেষে সকলে শান্তি ও সদ্‌ভাবে থাকতে পারবে।"

পণ্ডিচেরী থেকে প্রায় পাঁচ মাইল উত্তরে এই অরোভিল শহর স্থাপিত হয়েছে। জায়গাটির প্রাকৃতিক দৃশ্য অত্যন্ত মনোরম। পূর্বদিকে সমুদ্র। উত্তরে ও পশ্চিমদিকে কতকগুলি হ্রদ। ৫০ হাজার লোক বাস করতে পারে, এমনভাবে শহরটির পরিকল্পনা করা হয়েছে।

অরোভিল শুধু বিশ্বজনীন সাংস্কৃতিক শহর হবে না; জীবনকে সব দিক থেকে রূপান্তরিত করার একটা পদ্ধতিসহ ঐক্যবদ্ধ জীবনের একটা ছক এখানে দেওয়া হবে। যাঁরা জ্ঞানের মাধ্যমে বিবর্তন চান এটা হবে তাঁদেরই বাসস্থান। এখানেই রয়েছে বর্তমান মানবজাতির মুক্তির উপায়। তাদের বর্তমান সমস্যাগুলি সমাধানের উপায়।

শ্রীঅরবিন্দের আদর্শ অনুযায়ী যাঁরা জীবন যাপন করতে চান, বিশ্বের সেই-সব লোকের জন্য অরোভিল হবে তাদের মিলনস্থল। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সমস্ত মানুষ, যাঁরা আন্তরিকভাবে আত্মার উন্নতি কামনা করেন তাঁরা এখানে স্বাধীনভাবে বিশ্বের নাগরিক হিসেবে বাস করতে পারবেন। এটা হবে শান্তি, সাম্য, শুভেচ্ছার শহর, যেখানে মানুষের সংগ্রামশীল সমস্ত

ইচ্ছা, তার দুঃখ-দুর্দশার কারণগুলি জয় করার জন্য, তার দুর্বলতা ও অজ্ঞতা, তার সীমাবদ্ধতা ও অক্ষমতা জয় করার জন্য ব্যবহার করা হবে।

বিভিন্ন দেশের এবং ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে সংস্কৃতি-মূলক স্থায়ী প্রদর্শনী মঞ্চ তৈরি করা। যে-সব দেশ এখানে প্রদর্শনী মঞ্চ তৈরি করাবে সেগুলিতে সেই-সব দেশের সংস্কৃতি, স্থাপত্য, ভাষা, কলাশিল্প, জীবন-ধারণ-পদ্ধতি, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ইত্যাদি দেখানো হবে। এখানে যাঁরা বাস করবেন তাঁরা বিশ্ব-সংস্কৃতির সঙ্গে সজাগ সম্পর্ক রাখতে পারবেন এবং বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্য খুঁজে পাবেন।

প্যারিসে রাষ্ট্রসংঘের শিক্ষা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাধারণ পরিষদে অরোভিল সর্বসম্মতিক্রমে সমর্থিত হয়েছে এবং তিনটি প্রস্তাব পাস হয়েছে (১৯৬৬, ১৯৬৮ ও ১৯৭০)। ১৯৬৮ খৃস্টাব্দের প্রস্তাবে, সাধারণ সম্মেলন সদস্য রাষ্ট্রগুলিকে এবং আন্তর্জাতিক বেসরকারী সংগঠনগুলির কাছে আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক শহর হিসেবে অরোভিলকে গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়েছে। মানুষের শারীরিক ও মানসিক প্রয়োজন অনুযায়ী একটা সাম্যের আবহাওয়ায় ঐক্যবদ্ধ জীবন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সংস্কৃতি ও সভ্যতার মিলনই এই শহরটির লক্ষ্য।

অরোভিলের অধিবাসীদের উদ্দেশ্যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী একটি বাণীতে বলেছেন :

"পণ্ডিচেরী ছিল শ্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিক নির্বাসন ও আধ্যাত্মিক বিকাশের স্থান। পণ্ডিচেরী থেকে তাঁর পরমোজ্জ্বল বাণী বিশ্বের বিভিন্ন ভাগে ছড়িয়ে পড়েছে। বিভিন্ন দেশের

যে-সব ব্যক্তি জ্ঞানের আলোক খুঁজছেন তাঁরা যে শ্রীঅরবিন্দের নামানুসারে একটি শহর প্রতিষ্ঠা করছেন তা প্রশংসার যোগ্য। মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য যে উপযুক্ত পরিবেশ প্রয়োজন— সেদিক থেকে এটি একটি চমৎকার পরিকল্পনা। অরোভিল যেন প্রকৃতপক্ষে আলো ও শান্তির শহর হয়ে ওঠে।"

অরোভিলের গুরুত্ব বর্ণনা প্রসঙ্গে মা বলেছেন: পার্থিব সৃষ্টিতে মানুষই শেষ স্তর নয়। বিবর্তন হয়ে চলেছে এবং সেই বিবর্তন মানুষকেও অতিক্রম করবে। এই নতুন সৃষ্টিতে অংশ গ্রহণ করবেন কি না তা প্রত্যেকের নিজস্ব বিবেচ্য বিষয়। যাঁরা বর্তমান বিশ্ব নিয়েই সন্তুষ্ট আছেন তাঁদের কাছে অরোভিলের অস্তিত্বের কোনো অর্থই নেই।

কী করে প্রকৃত অরোভিলবাসী হওয়া যায় মা তারও ব্যাখ্যা দিয়েছেন: "প্রধান প্রয়োজন আত্মোপলব্ধি, যার মাধ্যমে, সামাজিক, নৈতিক, সাংস্কৃতিক জাতীয় ও বংশানুক্রমিক উপস্থিতির পেছনে প্রকৃতপক্ষে কে আছেন তা জানতে পারা যায়। আমাদের অন্তরতম কেন্দ্রে এমন একটা স্বাধীন সত্তা নিরন্তর জেগে আছেন যিনি আমাদের এই আবিষ্কারের জন্য উন্মুখ হয়ে থাকেন। আমাদের অরোভিলের জীবনে তাঁকেই সক্রিয় কেন্দ্র মেনে নেওয়া উচিত।

"নৈতিক ও সামাজিক রীতিনীতি থেকে মুক্ত থাকার উদ্দেশ্যেই লোকেরা অরোভিলে বাস করেন। কিন্তু এই স্বাধীনতা যেন কোনো প্রকারেই নিজের আত্মম্ভরিতা ইচ্ছা বা উচ্চাশার দাসত্ব না হয়ে দাঁড়ায়। বাসনার পরিতৃপ্তি আত্মোপলব্ধির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থতার

পরিচ্ছন্ন শুভ্রতায় ও শান্তির মধ্যেই শুধু তা অর্জন করা যায়।

"অরোভিলবাসীদের মালিকানা স্বত্বের মনোভাব অবশ্যই পরিত্যাগ করতে হবে। কারণ আমাদের জীবন এবং আমাদের কাজের জন্য এই পার্থিব জীবনটা যেখানে অপরিহার্য সেখানে আমাদের এখানকার জীবন অতিবাহিত করার জন্য একটা নির্দিষ্ট স্থান দিয়ে দেওয়া হয়। আমাদের আত্মার সঙ্গে সম্পর্ক যত বাড়তে থাকে আমাদের পার্থিব প্রয়োজন তত কমতে থাকে।

"আত্মোপলব্ধির জন্য কাজ, এমন-কি, শারীরিক পরিশ্রম বিশেষ প্রয়োজনীয়। কেউ যদি কাজ না করেন, কেউ যদি নিজের জ্ঞানকে বস্তুতে প্রবিষ্ট না করান তা হলে বস্তুরও বিকাশ ঘটবে না। দেহ দিয়ে কেউ যদি বস্তুতে জ্ঞান সঞ্চার করেন তা হলে তা খুব ভালো। নিজের চারিদিকে শৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারলে তা অন্তরেও শৃঙ্খলা স্থাপনে সাহায্য করে।

"সংগঠিত অধ্যাত্মিক জ্ঞান অনুযায়ী জীবন সংগঠিত করতে হয়, বাহ্যিক, কৃত্রিম নিয়ম অনুসারে নয়। কারণ উচ্চতর জ্ঞানের নিয়ন্ত্রণ ছাড়া জীবনকে যদি নিজের খেয়ালে বয়ে যেতে দেওয়া হয় তা হলে জীবন প্রকাশবিহীন ও চঞ্চলমনা হয়ে পড়ে। একদিক দিয়ে এটা হয়ে পড়ে সময়ের অপচয়, কারণ জ্ঞানের উপযুক্ত ব্যবহার না হওয়াতে বস্তু বস্তুই থেকে যায়।

"সমগ্র পৃথিবীকে নতুন সৃষ্টির আগমনের জন্য তৈরি হতে হবে। অরোভিল সজ্ঞানে সেই আগমনের জন্য কাজ করতে চায়। এই নতুন সৃষ্টি কী হবে তা আস্তে আস্তে আমাদের

কাছে প্রতিভাত হবে। যতদিন তা না হচ্ছে ততদিন নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ভগবানের কাছে উৎসর্গ করাই হল প্রকৃষ্ট ব্যবস্থা।

শ্রীঅরবিন্দের কথা দিয়েই আমরা বলতে পারি :

তবুও সত্যের ক্রমবিকাশ হবে সাম্য সম্ভাব বাড়বে
সেই দিন আসবে যখন মানুষ পরস্পরকে
আরো ভালোবাসবে, পরস্পরের আরো কাছে আসবে ;
অগ্রগতির পথে একটি পদক্ষেপও কিছুটা লাভ :
কারণ পৃথিবীর অনুজ্জ্বল আত্মা যতদিন পর্যন্ত না
সেই আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে জেগে উঠছে,
ততদিন তাকে আস্তে আস্তে স্বর্গের কাছে এগিয়ে
যেতে হবে।

কাল-নিরূপণ তালিকা

১৮৭২, ১৫ অগাস্ট : কলিকাতায় শ্রীঅরবিন্দের জন্ম।

১৮৭৭-৭৯ : ইংরেজী বোর্ডিং স্কুলে (দার্জিলিং)।

১৮৭৯-৮৪ : ম্যাংঞ্চস্টার, ইংল্যাণ্ড।

১৮৮৪-৯০ : সেণ্ট পলস্ স্কুল, লণ্ডন।

১৮৯০-৯২ : কিংস কলেজ, কেম্ব্রিজ।

১৮৯২-৯৩ : ভারতে প্রত্যাবর্তন, বরোদা।

১৯০১ : মৃণালিনী দেবীর সঙ্গে বিবাহ।

১৯০২ : বাংলায় বিপ্লবাত্মক কাজ।

১৯০৪ : যোগের আরম্ভ।

১৯০৬ : বরোদা থেকে কলিকাতা যাত্রা।

১৯০৭ ডিসেম্বর : যোগী লেলের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ।

১৯০৮, ৪ মে : ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক গ্রেফতার।

১৯০৮-০৯ : আলীপুর বোমার মামলা।

১৯০৯ -৬ মে : আলীপুর জেল থেকে মুক্তি।

১৯১০, ফেব্রুয়ারি : কলকাতা থেকে চন্দননগর যাত্রা।

১৯১০, ৪ এপ্রিল : পণ্ডিচেরীতে আগমন।

১৯১৪, ২৯ মার্চ : শ্রীঅরবিন্দ ও মা'র প্রথম সাক্ষাৎ।

১৯১৪, ১৫ অগাস্ট : আর্য পত্রিকার প্রকাশ আরম্ভ (একটি মাসিক দার্শনিক পত্রিকা)।

১৯১৫, ২২ ফেব্রুয়ারি : মা'র পণ্ডিচেরী পরিত্যাগ।

১৯২০, ২৪ এপ্রিল : মা'র স্থায়ীভাবে পণ্ডিচেরীতে প্রত্যাবর্তন।

১৯২১, জানুয়ারি : আর্য পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ।

১৯২৬, ২৪ নভেম্বর : সিদ্ধিলাভের দিবস।

১৯২৬ : শ্রীঅরবিন্দের অবসর গ্রহণ, আশ্রম পরিচালনার ভার মা'র হাতে সমর্পণ।

১৯৩৮, ২৪ নভেম্বর : শ্রীঅরবিন্দের পায়ে আঘাত লাগা। শ্রীঅরবিন্দকে ব্যক্তিগতভাবে সেবা করার ভার কয়েকজন সাধকের ওপর অর্পণ।

১৯৪৭, ১৫ অগাস্ট : শ্রীঅরবিন্দের ৭৫তম জন্মবার্ষিকীতে ভারতের স্বাধীনতা লাভ।

১৯৫০, ৫ ডিসেম্বর : শ্রীঅরবিন্দের পরলোক গমন।

১৯৫২ : শ্রীঅরবিন্দ আন্তর্জাতিক শিক্ষাকেন্দ্রের উদ্‌ঘাটন।

১৯৫৬, ১৯ ফেব্রুয়ারি : অতিমানসের অবতরণ।

১৯৬৮, ২৮ ফেব্রুয়ারি : অরোভিলের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন।

Printed at Dee Kay Printers, 5/16 Kirti Nagar, Indl. Area, New Delhi-110015